১ মার্চ ২০২৫ ■ দাম : ২৫ টাকা ■ পৃঃ ১

হাঁটু প্রতিস্থাপনের বিকল্প চিকিৎসা

সুস্বাস্থ্য

গুলেনবারি সিনড্রোম

- কখন অ্যালার্জি সাংঘাতিক
- সায়াটিকার ব্যথা থেকে রেহাই
- কীভাবে ইতিবাচক করে তুলবেন নিজেকে
- শান দিন মগজাস্ত্রে
- শ্বাসকষ্টের বাড়া–কমা খাওয়া দাওয়ায়
- চিকেন পক্স নিয়ে হেলাফেলা নয়
- ফুচকা নাকি মন ভালো রাখে

SERUM™

One of the largest chain Lab in India

SERUM 25 YR CARING

Every **Pathology**

TEST RESULT IS
IMPORTANT
BECAUSE IT'S
INVOLVE **YOUR LIFE**

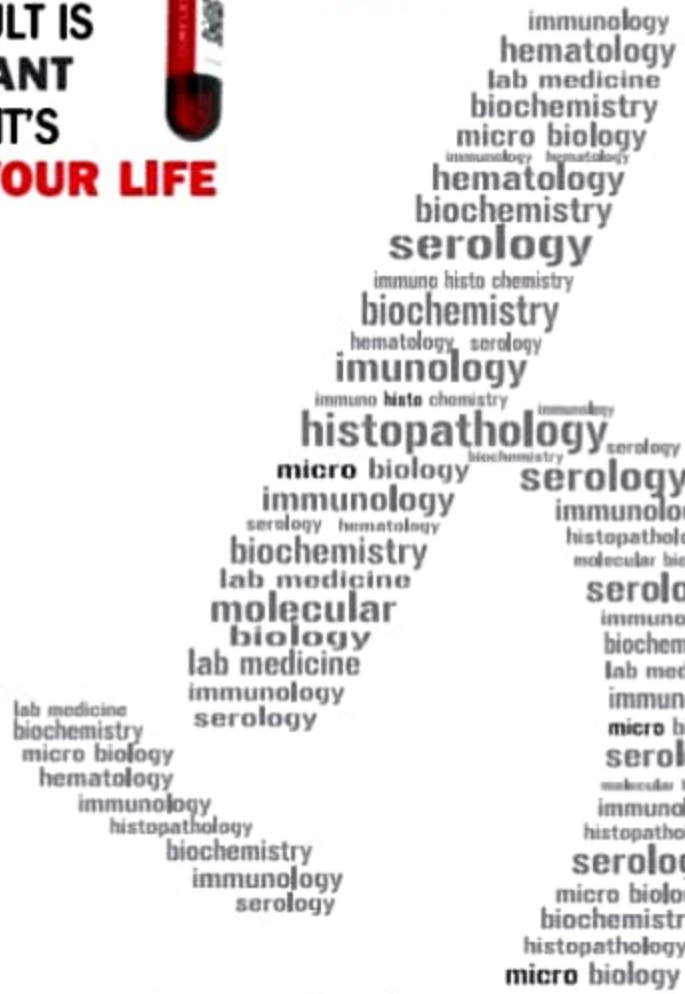

SERUM™ ANALYSIS CENTRE (P) LTD.

Regd. Office : 82/4B, Bidhan Sarani, Kol-4

62895 32188, 98302 74990

NABL ISO Asia One CGHS

SHYAMBAZAR	GARIAHAT	SALTLAKE	HOWRAH	SILIGURI	ASANSOL	MALDA	NEWTOWN
98300 66529	82405 63951	90079 21464	98301 64836	98009 56000	98300 16593	90513 99552	90513 99558

Regional Centres : Agartala | Allahabad | Bhubaneswar | Cuttack | Gangtok | Guwahati | Itanagar
Jabalpur | Jamshedpur | Patna | Port Blair | Ranchi | Raipur | Shillong | Varanasi | Kathmandu

www.sserumanalysiscentre.com | Follow us at : | Toll Free No. : 18001202014

bindumedia.co.in

সুস্বাস্থ্য

৩১ বর্ষ • ৮ সংখ্যা
১ মার্চ • ২০২৫

SUSWASTHA
31st Year ▫ 8th Issue
1st MARCH ▫ 2025

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা :
ডাঃ অবিনাশ চন্দ্র রায়
সম্পাদক : **দেবব্রত কর**
সহযোগী সম্পাদক : **কাঞ্চন সানা**
সম্পাদকীয় বিভাগ : **সামাদ মল্লিক**

বিজ্ঞাপন বিভাগ :
সুদীপ্তা দাস ৯৮৩০২০১৭৫১

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : **অমিত চট্টোপাধ্যায়**

মুখ্য পরিবেশক : **রবি সাহা**
ফোন : ২২৪৩-৮১১৩
মো : ৯৮৩০৩-৮৯৩৪২

বিপণন সহযোগী (বাংলাদেশ) :
আমির অ্যান্ড সন্স
৫৯/৩/১ পুরনো পল্টন,
ঢাকা-১০০০ (সুরমা টাওয়ারে পিছন)
দূরভাষ : ৮৮০-১৭১১১৩৭৮৫১

••

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক : দেবব্রত কর ২এ, ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন্স, 'জয়জয়ন্তী', কলকাতা-১৯ ফোন : ৯৮৩০০৬৭৩২৯ হইতে প্রকাশিত।
ই-মেল : suswastha9@gmail.com
Please Visit : www.suswastha.com
এবং দে'জ অফসেট,৩/২ মঠেশ্বরতলা রোড, কলকাতা-৪৬ কর্তৃক মুদ্রিত।

দাম ২৫ টাকা

[বিভিন্ন লেখায় যে-সমস্ত মডেলের ছবি দেওয়া হয়েছে, তাঁরা সংশ্লিষ্ট রোগে আক্রান্ত নন। স্রেফ লেখার প্রয়োজনেই ব্যবহার করা হয়েছে।
প্রচ্ছদ ও অন্যান্য ছবি : সৌজন্যে নেট পরিষেবা
তিন মাসের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে ধরে নিতে হবে লেখাটি অমনোনীত হয়েছে। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না, কপি রেখে পাঠান।]

বিমান মাশুল ত্রিপুরায় ১ টাকা।
উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যত্র ১.৫০ টাকা।

নিবেদন

'সুস্বাস্থ্য'তে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলিতে অসুস্থতা ও তার নিরাময় সম্পর্কিত পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্রের বক্তব্য সংশ্লিষ্ট লেখক বা চিকিৎসকের। দায়িত্ব পত্রিকার নয়। চিকিৎসা করান আপনার নিজস্ব চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে। এই পত্রিকায় প্রকাশিত যাবতীয় বিজ্ঞাপনের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপনদাতার। দায়িত্ব পত্রিকার নয়।

সম্পাদক, সুস্বাস্থ্য

হাঁটু বদল তো শেষ অস্ত্র। তার আগে অনেক বিকল্প আছে। হাঁটু না বদলেও স্বচ্ছন্দে হাঁটতে পারবেন আপনি। তারই সুলুক সন্ধান এবারের প্রচ্ছদে।

সূচিপত্র

- সম্পাদকীয় . ৫
- কথায় কথায় হাঁটু বদল কেন . ডাঃ নিখিলেশ দাশ ৭
- শিরদাঁড়ার সমস্যায় অবহেলা নয় . ডাঃ কৌশিক শীল ৯
- সায়াটিকার ব্যথা থেকে বাঁচতে . মৃণাল কুন্ডু ১২
- কখন অ্যালার্জি সাংঘাতিক . ডাঃ প্রমিতশ্রী ভট্টাচার্য ১৫
- কনট্যাক্ট লেন্সের সমস্যা . ডাঃ মোহন বসাক ১৭
- অ্যানিমিয়া থেকে মুক্তি . ডাঃ তুফান কান্তি দোলই ১৮
- পিত্তনালীতে বাধার বিপদ . ডাঃ সঞ্জয় ব্যানার্জী ২১
- ঘুমের অভাবে নানা রোগ . ডাঃ কুন্তল মাইতি ২৩
- গুলেনবারি সিনড্রোম . ডাঃ সওকত আলী ২৫
- টিউবারকুলার এন্ড্রোমেট্রাইসিস . ডাঃ সবুজ সেনগুপ্ত ২৯
- রোগ ব্যাধি নিয়েই মা . ডাঃ উজ্জ্বল আচার্য ৩২
- মগজাস্ত্রে শাণ . ডাঃ অঞ্জন ভট্টাচার্য ৩৫
- ইতিবাচক ভাবনা . ডাঃ অমর নাথ মল্লিক ৩৭
- হ্যালুসিনেশন . ডঃ শম্পা ঘোষ ৩৯
- ক্যানসারকে ভয় পাবেন না . ডাঃ স্বপন কুমার গোস্বামী ৪১
- চিকেন পক্স . ডাঃ কুণাল ভট্টাচার্য ৪২
- বসন্তের নিদান . ডাঃ ঋত্বিক সেন ৪৪
- টিউমারে হোমিওপ্যাথি . ডাঃ বিকাশ মন্ডল ৪৫
- ঘরের দুয়ারে যমদূত . ডাঃ শামসুল হক ৪৭
- হৃদরোগে ভেষজ . এম. দাস ৪৯
- শ্বাসকষ্টে খাওয়া-দাওয়া . কমলা আদক ৫১
- মন ভালো রাখতে ফুচকা . প্রফেসর কৃষ্ণজ্যোতি গোস্বামী ৫৪
- সুপারফুড স্ফিরুলিনা . সৌমেন্দ্র নাথ দাস ৫৬
- নিজেকে ভালোবাসবেন . এস. রায় ৫৭
- সুস্বাস্থ্যের রান্না . ভারতী কুন্ডু ৫৮
- আ মরি বাংলা ভাষা . ডাঃ অজয় কৃষ্ণ ঘোষ ৬০
- সংক্ষেপে . ৬২
- মানসিক প্রশ্নোত্তর . পার্থ প্রতিম রায় ৬৫

বুদ্ধি নাকি বাড়ানো যায় না। কিন্তু বিজ্ঞান কি থেমে থাকে? বুদ্ধি বাড়ানোর কৌশলও তাই আজ বিজ্ঞানীদের হাতের মুঠোয়। লিখেছেন অঞ্জন ভট্টাচার্য।

সুস্বাস্থ্য

আমাদের ইন্টারনেট অনুসন্ধান করুন

onlinesuswastha.com

আমাদের ইন্টারনেট অনুসন্ধান করুন

onlinesuswastha.com

আমাদের ইন্টারনেট অনুসন্ধান করুন

onlinesuswastha.com

সুস্বাস্থ্য

পাকিস্তান হয়ে উঠছে বাংলাদেশ

এতদিন ছিল সংখ্যালঘুদের ওপর বর্বরোচিত, পৈশাচিক আক্রমণ। এবার সেই হানাদারি নেমে এল ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার মতো নোংরামিতে। শেষ মুক্ত চিন্তা। শেষ বাঙালি অস্মিতা। এখন শুধুই ধর্মীয় গোঁড়ামির কঠোর অনুশাসন। তাই জাতির জনকের বাড়িঘরসহ সব স্মৃতি মুছে দেওয়ার এমন পৈশাচিক উন্মত্ততা। ফের যেন সেই পাকিস্তানেই ফিরে যেতে চাইছে বাংলাদেশ। যাদের নেতৃত্বে নাকি ওই দেশের ছাত্রসমাজ! কী রকম ছাত্রসমাজ, কে জানে! যারা জাতির পিতাকেই অস্বীকার করে। অস্বীকার করে দেশের শিকড়কেই। তিল তিল করে একটা দেশ অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে! একাত্তরের স্বাধীনতার যুদ্ধে আমাদেরও কম রক্ত ঝরেনি। কম স্বীকার করতে হয়নি ত্যাগ। তাই ভারত বিরোধিতার তথা বিশ্বাসঘাতকতার এমন প্রকাশে চরম বিস্মিত এপার বাংলা। এই দেশ। আর কি, তালিবানিরাজ শুরু হয়ে গেলে পড়শি দেশে। বাংলাদেশ ফের অবিশ্বাস্য দ্রুততায় হয়ে উঠছে পাকিস্তান! নাকি আফগানিস্তান? উত্তর দেবে সময়।

সুস্বাস্থ্যের ছড়া

উপকারী এলাচ

হিমাংশু আদক

মাইগ্রেনে উপকার
বলিরেখা সারে,
ক্যান্সারে ঝুঁকি কমে
খিদেটাও বাড়ে।

রক্তের চলাচলে
গতি রাখে ঠিক,
মানসিক চাপ হ্রাসে
দেখায় সে দিক।

রক্তের অম্লতা
দেয় দূর করে,
ওজনটা ঠিক রেখে
দেহখানি গড়ে।

সর্দি কাশিতে খুব
দেয় উপকার,
পরিপাকে এলাচকে
খুব দরকার।

রক্তের চাপটাকে
রাখে ঠিকঠাক,
এলাচের ব্যবহার
মান্যতা পাক।

ওষ্ঠাগত প্রাণ

আসগার আলি মন্ডল

আকাশ-বাতাস ভরছে বিষে
ধোঁয়া-ধুলো যাচ্ছে মিশে
বাঁচা বড়ই দায়।
হচ্ছে নিধন সবুজ যত
অট্টালিকা উঠেছে শত
শান্তি কোথা পায় ?

বদ্ধ যত গাঁয়ের পুকুর
ঝাপসা-ছায়া মনের মুকুর
চিন্তার নেই শেষ।
বাড়ছে দূষণ প্রতিটা দিন
তাজা শরীর হচ্ছে যে ক্ষীণ
ধুঁকছে আমার দেশ।

পলিথিনে ভরছে নালা
হচ্ছে জীবন ঝালাপালা
ওষ্ঠাগত প্রাণ।
গলছে বরফ প্রখর তাপে
বইছে নদী দুকূল ঝেপে
হচ্ছে বিলীন মান।

জল যুদ্ধ

প্রদীপ রঞ্জন রীত

চোখ পাকিয়ে বলল হেঁকে
দত্ত পাড়ার বুদ্ধ—
শুরু হবে এবার থেকে
জলকে নিয়ে যুদ্ধ।

বললে পাঁচু এবং নাড়ু—
ব্যাখ্যা করে বল্
আমরা জানি এই পৃথিবীর
তিনটি ভাগই জল।

বুদ্ধ বলে—সমস্যাটা
ব্যবহারিক জলে
মাত্র সেটা এক শতাংশ
হিসাব তাইই বলে।

মাটির নিচে জল তুলছি
লাগাম ছাড়া গতি
খুব শীঘ্র ভাঁড়ার ঘরে
পড়বে শেষের যতি।

যোগান থেকে চাহিদাটা
ছাড়িয়ে গেল প্রায়
চাপড়ে মাথা বলতে হবে—
কোথায় রে জল হায়!

বিস্ময়েতে বেবাক হল
নাড়ু এবং পাঁচু-—
এমন করে ভাবিনি তো...
মুখটা কাঁচুমাচু ।

চাস কি তোরা জলকে নিয়ে
কাড়াকাড়ির যুদ্ধ?
বন্ধ কর জল অপচয়—
হুকুম দিল বুদ্ধ।।

ট্রাফিক আইন

তপন কুমার বৈরাগ্য

জেব্রা ক্রসিং পাড়ি দেওয়ার
ট্রাফিক নিয়ম মানব,
শহর গঞ্জে চলতে গিয়ে
সঠিক যাহা জানব।

পথে যখন বের হবো ভাই
সাবধানেতে চলব,
রাস্তা যদি হারাই কভু
পুলিশকে তা বলব।

ব্যস্ত শহর পারাপারে
রাখবো সজাগ দৃষ্টি,
পড়বো না ভাই বিপদেতে
লাগবে জীবন মিষ্টি।

সবুজ হলুদ লাল বাতিটা
দেখব আমি স্পষ্ট,
ঝুঁকি নিয়ে অপর দিকে
গেলে জীবন নষ্ট।

অসাবধানে দুর্ঘটনা
সেই পথে না হাঁটবো
দেহের মায়া আছে বলে
বিপদগুলো ছাঁটবো।

রঙিন খাদ্য

সৈয়দ জাবের আলি

শাক-মূলো, কপি-পেঁপে
পড়ুন এদের বুকে ঝেঁপে।
সবুজ খাবার করুন আহার
পাবেন খাদ্য গুণের বাহার।

পাকা আম, কলা গাজর
করুন এদের মুখেশ্বর।
রঙে কমলা নয় আমলা
করে রক্ষা প্রতিরোধ হামলা।

ধান-গম, আর সাবুদানা
করুন এদের রোজ ভোজনা।
রঙে সাদা গুণে জাদা
শক্তি জোগায় কয় বোদ্ধা।

একটা সময় ছিল যখন মনে করা হত শুধুমাত্র বয়সকালেই আর্থ্রাইটিস শরীরে থাবা বসায়। কিন্তু আমাদের লাইফস্টাইল পরিবর্তনের কারণে এখন যে কোনও বয়সেই থাবা বসাতে পারে আর্থ্রাইটিস। এই আর্থ্রাইটিস বিভিন্ন রকমের হতে পারে। তবে সবচেয়ে বেশি ভোগায় অস্টিওআর্থ্রাইটিস। হাঁটুতে অস্টিওআর্থ্রাইটিস হওয়ার মানেই কি অস্ত্রোপচার, হাঁটু প্রতিস্থাপন? নাকি বিকল্প কোনও চিকিৎসা রয়েছে?

অস্টিওআর্থ্রাইটিস মানেই হাঁটু প্রতিস্থাপন নয়

ডাঃ নিখিলেশ দাশ

এমবিবিএস, এমএস (অর্থো), এম সি এইচ অর্থো (ইউ এস এ আই এম), কনসালট্যান্ট অর্থোপেডিক্স অ্যান্ড ট্রমাটোলজি সার্জেন, পিয়ারলেস হসপিটাল।

E-mail : soumik@peerlesshospital.com

Website : www.peerlesshospital.com

মোবাইল : ৯৬৭৪৮৫৬৮৯২

আর্থ্রাইটিস কী?

জয়েন্ট বা সন্ধিস্থলের ব্যথা। গ্রিক শব্দ 'আর্থো' অর্থাৎ জয়েন্ট বা সন্ধি এবং 'আইটিস অর্থাৎ ইনফ্ল্যামেশন বা প্রদাহ। এতে ব্যথার সঙ্গে জায়গাটা লাল হয়ে ফুলেযায়। আর্থ্রাইটিস কখনও একটি সন্ধিস্থলে,কখনও আবার একাধিক সন্ধিস্থলেও হয়। অনেক সময় ব্যথার জায়গাটা স্টিফ বা শক্ত হয়ে যায়। দীর্ঘদিন ধরে যাঁরা এ অসুখে ভোগেন, তাঁদের সন্ধিস্থল বেঁকে পর্যন্ত যেতে পারে।

কেন হয়?

- মূলত দায়ী আমাদের আধুনিক জীবনযাত্রা।
- কিছু কিছু ক্ষেত্রে আর্থ্রাইটিস বংশগত অসুখ হতে পারে। তাই পারিবারিক ইতিহাস থাকলে আর্থ্রাইটিস হওয়ার সম্ভাবনা কিছুটা থেকে যায়।
- ইনফেকশন ও কোনও আঘাতকে অবহেলা করলে ভবিষ্যতে তা আর্থারাইটিসের কারণ হতে পারে।
- ওবেসিটি বা মাত্রাতিরিক্ত ওজন আর্থ্রাইটিসের অন্যতম বড় কারণ। ওজন বেশি হলে কোমর ও হাঁটুতে বেশি চাপ পড়ে, আর তা থেকে অস্টিওআর্থ্রাইটিসের সম্ভাবনা বাড়ে।
- বারবার সন্ধিস্থলে চোট লাগলেও আর্থ্রাইটিস হতে পারে।

অস্টিওআর্থ্রাইটিস কী?

আর্থ্রাইটিস অনেক রকমের হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি হয় ডিজেনারেটিভ বা অস্টিওআর্থ্রাইটিস। এটা মূলত বয়সকালেই হয়। ৫৫ বা ৬০ পেরোলে এতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। মূলত হাঁটুর কার্টিলেজ ক্ষয় পেয়ে এ ধরনের আর্থ্রাইটিস হয়। হাঁটুর দুটি হাড়ের সন্ধিস্থলে থাকা ফ্লুইড বা তরল পদার্থ দুটি হাড়কে ঘর্ষণের হাত থেকে রক্ষা করে। যখন এই ফ্লুইড শুকিয়ে যায়, তখন হাড় কাছাকাছি চলে আসে এবং হাড়ে হাড়ে ঘষা লাগে। তখন তীব্র ব্যথা অনুভব হয়। ব্যথার পাশাপাশি পা স্টিফ বা বেঁকে যেতে পারে। ৬০ বছর বয়সের ঊর্ধে যাঁরা, তাঁদের শতকরা ৭০ ভাগ অস্টিওআর্থ্রাইটিসের শিকার।

অস্টিওআর্থ্রাইটিস দু-ধরনের—১) প্রাইমারি (বয়সের জন্য হয়) এবং ২) সেকেন্ডারি (চোট, দুর্ঘটনা, টিউমার, ফ্র্যাকচার ইত্যাদির কারণে হয়)।

রিস্ক ফ্যাক্টর

রিস্ক ফ্যাক্টর দু'রকমের—

- কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর রয়েছে যেগুলোর নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে থাকে না। যেমন বয়স। বয়সকে আমরা আটকাতে বা কমাতে পারব না। বয়স বাড়লে (৫৫-৬০ বছর পেরোলে) আর্থ্রাইটিস হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। মহিলাদের ক্ষেত্রে ৪৫ বছর পার হলেই আর্থ্রাইটিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
- কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর আছে যেগুলোর নিয়ন্ত্রণ কিন্তু আমাদের হাতেই রয়েছে। যেমন মাত্রাতিরিক্ত

ওজন বা ওবেসিটি, যা আর্থ্রাইটিসের অন্যতম বড় কারণ। ওজন বেশি হলে কোমর ও হাঁটুতে বেশি চাপ পড়ে। আর তা থেকে অস্টিওআর্থ্রাইটিসের সম্ভাবনা বাড়ে। তাই ওজনকে যদি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি তা হলে অস্টিওআর্থ্রাইটিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে। এ ছাড়া চোট-আঘাত থেকেও আর্থ্রাইটিস হতে পারে। তাই জয়েন্ট বা সন্ধিস্থলে যাতে আঘাত না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখুন।

রোগ শনাক্তকরণ

এক্স-রে, ব্লাড টেস্ট ও কিছু ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায় আপনি অস্টিওআর্থ্রাইটিসে আক্রান্ত কিনা।

অষ্টিওআর্থ্রাইটিস মানেই কি অস্ত্রোপচার, হাঁটু প্রতিস্থাপন?

একদমই তা নয়। অস্টিওআর্থ্রাইটিস শুনলে অনেকেরই মনে আসে অপারেশন করাতে হবে। আজকাল অনেক জিনিস বেরিয়েছে যেগুলো অপারেশন ছাড়াই ব্যবহার করে রোগীর কষ্টকে অনেকটাই লাঘব করা যায়। কার্টিলেজ ক্ষয় হলে তা ফেরত আনার কোনও উপায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাছে নেই।

অস্ত্রোপচার ছাড়া বিকল্প চিকিৎসা

- নন-মেডিক্যাল ম্যানেজমেন্ট।
- ফিজিওথেরাপি।
- বেল্ট, নি-ক্যাপ ও ব্রেস।
- ভিস্কো সাপ্লিমেন্টেশন।
- পি আর পি ইঞ্জেকশন।

নন-মেডিক্যাল ম্যানেজমেন্ট :

● **পেশেন্ট এডুকেশন :** রোগীকে তাঁর অসুখের যাবতীয় খুঁটিনাটি জানানো উচিত। যেমন তাঁর কী সমস্যা হচ্ছে, কতদিন ধরে হচ্ছে, পরিবারের আর কারও এই সমস্যা আছে কিনা ইত্যাদি। এ ছাড়া আর্থ্রাইটিস হলে কী করবেন আর কী করবেন না, তা রোগীকে বুঝিয়ে বলা হয়। যেমন পা ভাঁজ করে না বসা, ওজন বেশি থাকলে তা কমানো, কিছু নির্দিষ্ট ব্যায়াম বলে দেওয়া, কী ধরনের জুতো পরলে পা ভাল থাকবে ইত্যাদি।

● **শরীরচর্চা :** শরীরচর্চা একদিকে যেমন শরীরকে সচল ও কর্মক্ষম রাখতে খুবই উপযোগী, তেমনই পেশির শক্তি বাড়াতে ও সন্ধিস্থলের নাড়াচাড়া ঠিক রাখতে যথেষ্ট সহায়তা করে। এ ছাড়া ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়মিত শরীরচর্চা খুবই জরুরি।

● **ওজন না বাড়ানো :** হাঁটুতে যাতে বেশি চাপ না পড়ে, তার জন্য ওজন কম রাখা। ওজন যাতে না বাড়ে তার জন্য একদিকে যেমন শরীরচর্চা দরকার, তেমনই অন্যদিকে প্রয়োজন সঠিক খাদ্যাভ্যাস।

ফিজিওথেরাপি :

আজকাল ফিজিওথেরাপিস্টের ছড়াছড়ি। কিন্তু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ফিজিওথেরাপিস্ট ছাড়া ফিজিওথেরাপি করালে সুস্থ হওয়ার চেয়ে বরং বেশি অসুস্থই হয়ে পড়তে হয়। তাই অবশ্যই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ ফিজিওথেরাপিস্টের পরামর্শে ফিজিওথেরাপি করালে অস্টিওআর্থ্রাইরিটিসের কষ্ট অনেকটাই লাঘব হয়।

বেল্ট, নি-ক্যাপ ও ব্রেস :

অস্টিওআর্থ্রাইটিস কোমরে হলে বেল্ট ও হাঁটুতে হলে নি-ক্যাপ পরার পরামর্শ দেওয়া হয়। আর একে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য রয়েছে ব্রেস।

দীর্ঘদিন অস্টিওআর্থ্রাইটিসের ফলে অনেকের পা বেঁকে যায়, তখন বাঁকা পা সোজা করা বা হাঁটার উপযোগী করে তোলার জন্য অফ-লোডিং ব্রেস লাগানো হয়।

এর সঙ্গে রোগীকে সামান্য পরিমাণ ব্যথা কমানোর ওষুধ ও মলম দেওয়া হয়। বরফ দিয়ে সেঁক দিতেও বলা হয়।

ভিস্কো সাপ্লিমেন্টেশন :

হাঁটুর দুটি হাড়ের সন্ধিস্থলে থাকে এক ধরনের ফ্লুইড বা তরল পদার্থ, যা হাড়কে ঘর্ষণের হাত থেকে রক্ষা করে। যখন এই ফ্লুইড শুকিয়ে যায়, তখন হাড় কাছাকাছি চলে আসে এবং হাড়ে হাড়ে ঘষা লাগে এবং ব্যথা অনুভব হয়। এর থেকে রিলিফ দেওয়ার জন্য ভিস্কো সাপ্লিমেন্টেশন নামে এক ধরনের কৃত্রিম ফ্লুইড হাঁটুতে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে দেওয়া হয়।

প্লেটলেট রিচ প্লাজমা (পি আর পি) :

শরীর থেকে ৩০ এমএল রক্ত নিয়ে সেই রক্ত থেকে এক ধরনের তরল (৩-৪ এমএল) প্লেটলেট রিচ প্লাজমা বের করা হয়। যা ইঞ্জেকশনের (পি আর পি ইঞ্জেকশন) মাধ্যমে হাঁটুতে দেওয়া হয়। যা হাঁটুর ক্ষয় রোধ করতে সক্ষম।

এখন অনেক সময়ই ভিস্কো সাপ্লিমেন্ট ও পি আর পি ইঞ্জেকশন একসঙ্গে মিশিয়েও দেওয়া হয়। এগুলো সাধারণত ১ থেকে দেড় বছর পর্যন্ত কাজ করে এবং রোগী নিজেই নিজের কাজ করতে সক্ষম হন।

অস্টিওআর্থ্রাইটিস থেকে বাঁচার উপায়

● প্রথমেই দরকার জীবনযাত্রার পরিবর্তন।

● আর্থ্রাইটিসের বংশগত ইতিহাস থাকলে আগে থেকেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

● সন্ধিস্থলে যাতে বেশি চাপ না পড়ে সেদিকে খেয়াল রাখুন।

● শরীরে ভিটামিন ডি-র পরিমাণ কম থাকলে আর্থ্রাইটিসের সম্ভাবনা বাড়ে। তাই চিকিৎসকের পরামর্শে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভিটামিন ডি খাওয়া উচিত।

● শরীরের ওজন বাড়তে না দেওয়া। নিয়মিত সময় অন্তর ওজন মাপান। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ফাস্ট ফুড, জাঙ্ক ফুড ইত্যাদি এড়িয়ে চলুন।

● নিয়মিত শরীরচর্চা করুন।

শেষের কথা

অস্টিওআর্থ্রাইটিস শুনলে অধিকাংশ মানুষই ভাবেন অস্ত্রোপচার বা হাঁটু প্রতিস্থাপন। এই ভয়ে অনেকেই চিকিৎসা করান না। এটা একেবারেই ভুল ধারণা। আমাদের সব সময়ই চেষ্টা থাকে অপারেশন না করে রোগীকে সুস্থ রাখা। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির কল্যাণে আজ অস্ত্রোপচার না করেই অস্টিওআর্থ্রাইটিসের কষ্টকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হচ্ছে। ❑

শিরদাঁড়ার সমস্যায় অবহেলা নয়

ডাঃ কৌশিক শীল
(বিশিষ্ট নিউরো বিশেষজ্ঞ)
মোবাইল : ৯৪৩৩২৬৫৯৪৩

শিরদাঁড়ার অসুখ অর্থাৎ মেরুদন্ডের অসুখ। মেরুদন্ডের মধ্যে যে হাড় থাকে সেই হাড়ের অসুখকেও শিরদাঁড়ার অসুখ বলে। মেরুদন্ডের দুটো হাড়ের মধ্যে যে ডিস্ক থাকে সেই ডিস্কগুলো খারাপ হয়ে গেলে সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া আমাদের মেরুদন্ডের শিরদাঁড়ার মধ্যে দিয়ে নার্ভও যায়, সেই স্পাইনাল নার্ভের অসুখকেও শিরদাঁড়ার অসুখ বলা হয়।

আমাদের শরীরে শিরদাঁড়ার ভূমিকা বহুবিধ। শুধু তো ভার্টিব্রা নয়, বিভিন্ন পেশি, লিগামেন্ট সবাই মিলেই সাহায্য করে শিরদাঁড়ার কাজে। দাঁড়ানো, হাঁটা, বসা, পাশ ফেরা ছাড়াও পুরো শরীরটার ভার বহন করা, ছন্দমাফিক চালনা করা প্রভৃতি শিরদাঁড়ারই কাজ। এর সাহায্যেই আমরা শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখি। একদিকে ঝোঁকার সময়ে যেমন সেদিকের পেশিগুলোর ক্রমশ সংকোচন হয় তেমনি উল্টোদিকের পেশিগুলো ক্রমশ প্রসারিত হতে থাকে। এভাবেই ভারসাম্য রক্ষার ফলে আমাদের স্পাইনাল কর্ড ও বিভিন্ন নার্ভ আচমকা নানা আঘাত থেকে বাঁচে।

শিরদাঁড়ার অসুখ নানান বয়সে নানারকম। যখন আমরা ছোট থাকি, ১০–১৫ বছর বয়সে—খেলাধুলোর জন্য অনেক সময় শিরদাঁড়ায় চোট বা আঘাত লাগে।

ত্রিশ বছর বয়সের পর প্রধানত ডিস্কের সমস্যা হয়। ডিস্কগুলো ক্ষয়ে যায়, ডিস্কগুলোর মধ্যে জল জমে যায়, সেখান থেকে ব্যথা হতে থাকে।

ত্রিশ বছর বয়সে কিংবা বয়স হলে যে সমস্যা হয় সেটা হল প্রধানত হাড় বেড়ে যাবার সমস্যা। এর ফলে স্পাইনাল ক্যানালটা সরু হয়ে যায় এবং সরু হবার জন্য নার্ভের ওপর চাপ পড়ে এবং তার জন্য খুব ব্যথা হতে থাকে। একে বলে লাম্বার ক্যানাল স্টেনোসিস। স্টেনোসিস মানে ছোট হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ ক্যানালটা ছোট হয়ে যায়।

শিরদাঁড়া নিয়ে সবচেয়ে প্রচলিত সমস্যা হল ঘাড়ে ব্যথা। হঠাৎ ঘাড় ঘোরাতে গিয়ে বা ভারী জিনিস তুলতে গিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। ডিস্কের মধ্যে জেলির মতো যে পদার্থ থাকে তা বাইরে বেরিয়ে এসে নার্ভে চাপ দিলে এই সমস্যা দেখা দেয়।

এছাড়া স্পাইনাল নার্ভেও টিউমার হয়, তার কারণেও ব্যথা হয়। শিরদাঁড়ার কোনো অংশে সমস্যা দেখা দিলে ঘাড়, পিঠ, কোমর, পা প্রভৃতি নানা অংশে ব্যথা হতে পারে।

শিরদাঁড়া নিয়ে সবচেয়ে প্রচলিত সমস্যা হল ঘাড়ে ব্যথা। হঠাৎ ঘাড় ঘোরাতে গিয়ে বা ভারী জিনিস তুলতে গিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। ডিস্কের মধ্যে জেলির মতো যে পদার্থ থাকে তা বাইরে বেরিয়ে এসে নার্ভে চাপ দিলে এই সমস্যা দেখা দেয়।

শুধুমাত্র গরম সেঁক ও বিশ্রাম নিলে দিন সাতেকের মধ্যে সমস্যা মিটে যায়।

স্লিপড ডিস্ক

পেশাগত কারণে দীর্ঘদিন ধরে শিরদাঁড়ায়

চাপ, অতিরিক্ত দেহের ওজন এবং বার্ধক্যজনিত কারণে ডিস্কের জেলির মতো অংশ বেরিয়ে আসতে পারে। এটি শুরু হলে আর স্বাভাবিক হয় না। অনেকটা টিউব থেকে টুথপেস্ট বেরোনোর মতো। একে বলে স্লিপড ডিস্ক। এই জেলি শিরদাঁড়ার চারপাশে নার্ভের ওপর চাপ সৃষ্টি করে, ব্যথা শুরু হয় ঘাড়ে, পিঠে, কোমরে।

শিরদাঁড়ার উপর চাপ কমানো হল স্লিপড ডিস্কের চিকিৎসা। ব্যথা কমার বড়ি, গরম সেঁক, ব্যায়াম, ট্রাকশন কিংবা বিশেষ ধরনের বেল্ট ব্যবহার করলে আরাম বোধ হয়।

স্পন্ডাইলোসিস

এই রোগ সাধারণত ত্রিশ বছর বয়সের পর হয়। শিরদাঁড়ায় ক্রমাগত চাপ পড়ার ফলে একটু করে ক্ষয়ে যেতে থাকে বিভিন্ন ভার্টিব্রা। অনেকক্ষণ বসে বা দাঁড়িয়ে যারা কাজ করেন তাদের ঘাড়ের পেশিতে চাপ পড়ে। চাপ পড়ে হাড়ে। ক্ষয়ে যেতে থাকে পেশি ও হাড়। ছাত্রছাত্রীদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা বইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ার কারণে হয় স্পন্ডিলাইটিস। ভারী মাল বইতে গিয়ে যে সব মজুর বা মুটেদের বার বার ঘাড় বা কোমরে চাপ পড়ে তাদের এটা হতে পারে।

এ রোগের উপসর্গ ঘাড়ে, কোমরে, পিঠে, কাঁধে অসহ্য ব্যথা।

রোগ নির্ণয় করার জন্য শিরদাঁড়ার এক্স-রে, রক্তের টি.সি.ডি.সি, ই.এস.আর, সুগার ইত্যাদি পরীক্ষা, বিশেষ ক্ষেত্রে সি.টি. স্ক্যান, এম.আর.আই করতে হয়।

এই রোগ এড়াতে বেশি ঝুঁকে পড়াশোনা বা অন্য কাজ করলে হবে না। দেহের ওজন কমাতে হবে।

শিরদাঁড়ায় বারে বারে যাতে চোট না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

নরম গদি বা তোষক এবং উঁচু বালিশ ব্যবহার না করাই ভালো।

নিয়মিত হালকা ব্যায়াম করা দরকার।

অ্যাঙ্কাইলোজিং স্পন্ডিলাইটিস

এই ক্ষেত্রে ব্যথা শুরু হয় পিঠের নীচের দিকে, কোমরে। ধীরে ধীরে ব্যথা শিরদাঁড়া বেয়ে ওপরে ওঠে। ঘাড় আড়ষ্ট হয়ে যেতে পারে। সামনের দিকে ঝুঁকে যেতে পারে। হাঁটু, কাঁধ ও কোমরের সন্ধিতে আড়ষ্টতা ছড়াতে পারে। এ অবস্থায় রোগীর হাঁটাচলার অসুবিধে হয়।

শুরুতে রোগ নির্ণয় হলে ওষুধ ও ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে সচল করা হয় আড়ষ্ট মাংসপেশি। প্রয়োজনে শিরদাঁড়ায় সাপোর্ট দেওয়া হয়। দরকারে অপারেশনও করা হয়।

স্কোলিওসিস

অনেক সময় শিরদাঁড়া এঁকেবেঁকে থাকে জন্ম থেকেই, তাকে বলে স্কোলিওসিস।

অন্যান্য রোগ

নানা ধরনের সংক্রমণের ফলে শিরদাঁড়ায় অস্টিওমায়েলাইটিস রোগটি হতে পারে। পায়োজেনিক, টিবি বা সিফিলিস এই তিন ধরনের সংক্রমণ হতে পারে।

এ ছাড়াও শিরদাঁড়ায় যে কোনো ভার্টিব্রায় বিনাইন বা ম্যালিগন্যান্ট, যে কোনো টিউমার হতে পারে। যেখানে টিউমার হবে সেই জায়গা প্রথমে ফুলে উঠবে। অতএব শিরদাঁড়ার কোনো অংশ ফুলে উঠলে একদমই অবহেলা করবেন না।

একটু বেশি বয়সে শিরদাঁড়ায় অস্টিওপোরোসিস হতে পারে। এতে হাড় ফাঁপা ও দুর্বল হয়ে ভেঙে যায়। তাছাড়া বয়স হলে মানুষ কুঁজো হয়ে যায়। শিরদাঁড়ার হাড় ক্ষয়ে গিয়ে নরম হয়ে যায়। ফলে সামনের দিকে ঝুঁকে যায়। বেল্ট ব্যবহার করলে কুঁজোভাব অনেকটাই কমে। তবে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ মতো চলা উচিত।

শিরদাঁড়ায় টিবি

কোমরের উপরের দিকে দুটো ভার্টিব্রা অনেক সময়ে টিবির জীবাণু মাইক্রোব্যাক্টেরিয়ামের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। এই রোগ শিশুদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। সাধারণত দেখা যায় খেলাধুলোর পর ফিরে এসে বাচ্চারা পিঠে ব্যথার কথা জানায়। বাচ্চাদের ওজন কমতে পারে, খিদে কমে যায়। অবহেলার কারণে অনেক সময় রোগটি থেকে প্যারালিসিস হতে পারে। শিরদাঁড়ার টিবি বছর খানেকের চিকিৎসায় সহজে সারে।

সায়াটিকা

আমাদের শিরদাঁড়ার একদম নীচের ভার্টিব্রা স্যাক্রাম দিয়ে যে নার্ভরুটগুলো বার হয় সেগুলোকে একসঙ্গে বলা হয় সায়াটিকা নার্ভ। এটি আবার নানা শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে ছড়িয়ে পড়ে কোমর থেকে পায়ের গোড়ালির পেশিতে। কোনো কারণে শিরদাঁড়ায় কোনো আঘাত

লাগলে, ডিস্ক প্রোলাপ্স হলে, শিরদাঁড়ায় টিউমার হলে নার্ভে চাপ পড়ে সায়াটিকা পেন হতে পারে। সায়াটিকার উপসর্গ হল কোমরে ব্যথা। ব্যথা নামে কোমর থেকে ক্রমশ পায়ের দিকে। অভিজ্ঞ ডাক্তারের সাহায্যে চিকিৎসা করলে রোগ সেরে যায়। এত সব রোগের তথ্য জানার পরে তাহলে বোঝাই যাচ্ছে শিরদাঁড়া আমাদের শরীরে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিরদাঁড়ার যাই অসুখ হোক না কেন মোটামুটিভাবে শুরু হয় কোমরে ব্যথা দিয়ে। কোমরের ব্যথা এখন মোটামুটিভাবে সবারই। তবে কোমরে ব্যথা মানেই উপরে উল্লেখিত ওই ধরনের অসুখগুলো হয়েছে, তা কিন্তু নয়। শতকরা ষাট ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে কোমরের ব্যথার আসল কারণ পশ্চার। শোবার পশ্চার, দাঁড়ানোর পশ্চারে ভুল থাকার কারণে কোমরে ব্যথা হয়। কাজের পরিবেশটাকে যদি ঠিকমতো মূল্যায়ন করে, বসার চেয়ারটাকে লাম্বার সাপোর্ট ওয়ালা বসার চেয়ারে পরিণত করা যায় বা শোওয়ার সময় যদি সোজা হয়ে শোওয়া বা পাশ ফিরে দুটো পা একসাথে ফোল্ড করে শোওয়া যায়, তাহলে পিঠের স্ট্রেনটা কমে যায়।

বাঁকাচোরা ভাবে শোওয়ার জন্য বা দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে কাজ করলে অথবা বসার চেয়ার এবং টেবিল যদি ম্যাচ না করে তাহলে কিন্তু পিঠের ব্যথা হবে ষাট ভাগ ক্ষেত্রে। বাকি ২০ থেকে ৩০ ভাগ ক্ষেত্রে থাকে বয়সজনিত কারণ, স্লিপড ডিস্ক, লাম্বার ক্যানাল স্টেনোসিস।

কোমরের ব্যথায় গরম সেঁক, ফিজিওথেরাপি দিলে আরাম হয়। কিছু ক্ষেত্রে পেন কিলার লাগে। কিন্তু ব্যথা যখন আস্তে আস্তে পায়ে নামে তখন দুটো পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরে এবং কিছুটা হাঁটাচলা করলে পায়ে ক্র্যাম্প ধরে, আস্তে আস্তে পায়ের পাতা বসে যায়— এগুলো কিন্তু ওয়ার্নিং সিগন্যাল। এগুলো হবার পরও যদি গুরুত্ব না দেওয়া হয় তাহলে ইউরিনের সমস্যা হয়। ইউরিন হয় না, ইউরিন করতে করতে আটকে যায়। এই স্টেজে গেলে একদম সোজা অপারেশন করতে হয়।

প্রথম স্টেজ হচ্ছে, যেখানে কোমরে ব্যথা করে সেখানে অপারেশন লাগে না। যখন পায়ে ব্যথা নামে তখন একটু সিরিয়াস হয়। এই সময় নিউরোপ্যাথি মেডিসিন নানারকম দেওয়া হয়। তাতে না কমলে অপারেশন। কিন্তু মনে রাখতে হবে একবার যদি ইউরিনের সমস্যা এসে যায় তখন অপারেশন ছাড়া গতি নেই।

বাঁকাচোরা ভাবে শোওয়ার জন্য বা দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে কাজ করলে অথবা বসার চেয়ার এবং টেবিল যদি ম্যাচ না করে তাহলে কিন্তু পিঠের ব্যথা হবে ষাট ভাগ ক্ষেত্রে। বাকি ২০ থেকে ৩০ ভাগ ক্ষেত্রে থাকে বয়সজনিত কারণ, স্লিপড ডিস্ক, লাম্বার ক্যানাল স্টেনোসিস।

১০০ জনের যদি শিরদাঁড়ার কারণে কোমরে, পায়ে ব্যথা হয় তাহলে ১ থেকে ২ জনের অপারেশন লাগে। শতকরা নব্বইভাগ ক্ষেত্রে বেডরেস্ট, ব্যথার ওষুধ, গরম সেঁক, ফিজিওথেরাপি আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে ট্র্যাকশন লাগে।

যাদের লাম্বার ডিস্কের সমস্যা থাকে বা ক্যানাল স্টেনোসিস থাকে তাদের বছরে কয়েকবার সায়াটিকার পেইন হয়। ব্যথা হলে বিশ্রাম নিতে হবে। বিশ্রামের সঙ্গে সঙ্গে ফিজিওথেরাপি করতে হবে। আর কিছু ওষুধপত্র আছে সেগুলো খেলে ব্যথা নিয়ন্ত্রণে থাকে। এই ধরনের শিরদাঁড়ার সমস্যা পরীক্ষা করে ডাক্তারবাবুরা বুঝতে পারেন কোনটা কী কারণে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত সবাইকেই এম.আর.আই করতে হয়। এম.আর.আই করার পর কিছু মেজারমেন্ট আছে—কতটা কম, কতটা বেশি বা কতটা খারাপ, এসব দেখে অপারেশনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

শিরদাঁড়ায় যে অপারেশন করা হয় তাতে ঝুঁকি খুবই কম। একমাত্র স্পাইনাল টিউমারে একটু ঝুঁকি থাকে। স্পাইনাল টিউমারে অপারেশন যেহেতু নার্ভের মধ্যে করা হয় তাই ৫ থেকে ১০ ভাগ নার্ভের ক্ষমতা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কিন্তু নরমাল স্পাইন অপারেশন সেটা ডিস্কের কারণে কিংবা হাঁটাচলার জন্য হোক না কেন, তাতে কিন্তু স্পাইনের কোনো ঝুঁকি নেই।

অপারেশনের পর সুস্থ হতে কত দিন লাগে

সাধারণত মাইক্রোসার্জারি করা হয়। আজ অপারেশন হলে কাল ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। বাড়িতে গিয়ে দিন সাতেকের মধ্যে রোগী ফিরে যেতে পারেন নিজের কর্মজগতে। যদি খুব ভারী ধরনের কাজ করতে হয় বা শিল্পমাধ্যমে কোনো কাজ হয় তাহলে রোগীকে ১৫ দিনের জন্য বিশ্রাম নিতে বলা হয়। অফিস জবের যে কোনো কাজে এক সপ্তাহ বিশ্রাম নিলেই হবে। ওপেন সার্জারি হলে এক সপ্তাহ হসপিটালে থাকতে হয়। বাড়িতে দু'সপ্তাহ বিশ্রাম নিতে বলা হয়। তিন সপ্তাহের মাথায় রোগী কাজে ফিরে যেতে পারে। ❐

সাম্প্রতিককালে সবথেকে বেশি যে সমস্যার মুখোমুখি মানুষজন হচ্ছেন তা হল কোমরের ব্যথা। কোমরের ব্যথা যখন কোমরেই থাকে তখন সেটাকে অর্থোপেডিক সমস্যা বলা হয়। কিন্তু এই ব্যথা যখন পায়ের দিকে অর্থাৎ থাই, পায়ের হাঁটুর পিছনে, পায়ের পাতায় ছড়িয়ে পড়ছে তখন সেটাকে বলা হয় স্নায়ুজনিত ব্যথা বা নিউরোপ্যাথিক পেইন।

সায়াটিকা ব্যথা

ইচ্ছেমতো ওষুধ খেলেই বিপদ বেশি

মৃণাল কুন্ডু
(বিশিষ্ট ফিজিওথেরাপিস্ট; ফাউন্ডার অ্যান্ড সি.ই.ও, এম.আর ফিজিও অ্যান্ড রিহ্যাব পি.ডি.টি)
মোবাইল : ৮০১৩১০৭৫৮৪

করোনার পর জীবনে বদল এসেছে অনেকখানি। গতি কমেছে। শুরু হয়েছে নতুনি কালচার 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম'। পৃথিবী হাতের মুঠোয় হলেও শারীরিক পরিস্থিতি কিন্তু চলে যাচ্ছে হাতের বাইরে।

সাম্প্রতিককালে সবথেকে বেশি যে সমস্যার মুখোমুখি মানুষজন হচ্ছেন তা হল কোমরের ব্যথা। কোমরের ব্যথা যখন কোমরেই থাকে তখন সেটাকে অর্থোপেডিক সমস্যা বলা হয়। কিন্তু এই ব্যথা যখন পায়ের দিকে অর্থাৎ থাই, পায়ের হাঁটুর পিছনে, পায়ের পাতায় ছড়িয়ে পড়ছে তখন সেটাকে বলা হয় স্নায়ুজনিত ব্যথা বা নিউরোপ্যাথিক পেইন।

এটাকে আমরা রেডিকুলোপ্যাথি বলে চিহ্নিত করি। এর অর্থ হল মেরুদন্ডের স্নায়ু গোড়ায় সংকুচিত হওয়ার কারণে ব্যথা, অসাড় হয়ে যাবার পরিস্থিতি তৈরি হয়। এর জন্য অর্থোপেডিক বা নিউরো চিকিৎসকরা কিছু কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর ব্যাপারটাকে চিহ্নিত করেন।

আমাদের কোমরের ভার্টিব্রাগুলো পরপর সাজানো থাকে। তার পাশ থেকে আমাদের শরীরের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নার্ভ গাছের ডালপালার মতো চারদিকে ছড়িয়ে গেছে। এবার কোমরের ডিস্কগুলো যদি কোনো কারণে জায়গা থেকে সরে যায় তখন সেই জায়গার নার্ভগুলো

ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে তারা তাদের নির্দিষ্ট কাজগুলো সঠিকভাবে করতে পারে না। তখন শুরু হয় ব্যথা, বেদনা। যেগুলোকে আমরা রেডিকুলোপ্যাথি বা নিউরোপ্যাথিক পেইন বলে থাকি।

ব্যথার কারণ

সায়াটিকা ব্যথা তখন আসে যখন দীর্ঘদিন ধরে কোনো ব্যক্তি 'লো ব্যাক পেইন'-এ ভোগেন। অর্থৎ পিঠের একেবারে নীচের দিকের অংশে ব্যথা। 'লো ব্যাক পেইন'-এর প্রকৃতি নিয়ে কিছু কথা বলার আছে। কিছুদিন আগে অর্থাৎ বলা যায় করোনার আগে এটা দেখা যেত ৪০-এর উর্ধ্বের মানুষদের ক্ষেত্রে, কিছু কিছু ভুল ভঙ্গিতে কাজকর্ম করার জন্য, যেমন—

- ঝুঁকে কাজ করা, ঘর মোছা ইত্যাদি।
- বাসন মাজা, কাপড় কাচা, ঝাঁট দেওয়া।
- বেঁকে বসা।
- ভারি জিনিস নিয়মিতভাবে বয়ে আনা।

কিন্তু করোনার পরে চিত্রটা অনেকখানি বদলে গেছে। করোনা আমাদের শিখিয়েছে কীভাবে ঘরে বসে সব ধরনের কাজকর্ম করা যায়। বিশেষ করে অফিসের কর্মচারিদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম'। এর সুফল সর্বজনবিদিত কিন্তু কুফল নিয়ে চিন্তাভাবনার সময় এসে গেছে। আর কুফল কিন্তু আমাদের কিছু অভ্যাসের কারণে তৈরি হয়েছে যেগুলো সম্পর্কে সতর্ক হওয়া খুব দরকার।

বসার ভুল ভঙ্গি

'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' করা হচ্ছে ল্যাপটপে। সেক্ষেত্রে দীর্ঘক্ষণ বসে কাজ করতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে কীভাবে বসলে তার কোমরে চাপ পড়বে না, ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বা কী ভঙ্গিমায় তার বসা

উচিত নয়, এটা বেশিরভাগ মানুষই জানেন না বা সতর্ক নন। ফলে ঘরে থাকার সুবাদে কেউ কাৎ হয়ে বা বেঁকে বসে বা ভুল ভঙ্গিমায় বসে, শুয়ে যেভাবে হোক কাজ করে যাচ্ছেন। এর কারণস্বরূপ ব্যাক পেইন আসছে। আর এই ব্যাক পেইনকে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে অর্থাৎ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ না করে, প্রয়োজনীয় ব্যায়াম না করে নিজেরা কিছু ওষুধ খেয়ে সাময়িক স্বস্তি অনুভব করে চালিয়ে গেলে তার ফলশ্রুতি সায়াটিকা নার্ভ ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সায়াটিকা ব্যথার সৃষ্টি করে।

নিরাময়ের উপায়

এই সমস্যা তৈরি হওয়ার কারণ আমাদের অসতর্ক জীবনযাত্রা বা শোওয়া, বসার ভুল ভঙ্গিমা। তাই প্রকৃতিগত কারণে এই ব্যথার সৃষ্টি হচ্ছে এবং আশার কথা হল এর কিছু কিছু নিরাময় বা প্রতিরাধের উপায়ও থাকে প্রকৃতিগত বিষয়ের মধ্যে।

● ব্যায়াম। ব্যাক এক্সটেনশন এক্সারসাইজ অর্থাৎ মেরুদন্ড পিছনে করে যে ব্যায়াম।

● উপুড় হয়ে শুয়ে ভুজঙ্গাসন।

● উপুড় হয়ে শুয়ে পা যতটুকু ওঠে ওপরে তোলা।

● কোমরে হাত দিয়ে পিছন দিকে শরীরকে হেলানো ইত্যাদি।

এর ফলে আমাদের মেরুদন্ডের যে অংশগুলো জায়গা থেকে সরে গেছে সেগুলো জায়গামতো চলে আসে।

এইগুলো তখনই করা যাবে যখন কোমরের ব্যথা অল্পস্বল্প হতে শুরু করেছে। অর্থাৎ এ অবস্থা থেকেই সচেতন হতে হবে। এক্ষেত্রে আরো বিশদে বলি।

■ প্রকৃতিগত কারণে নিরাময়

● জীবনধারা পরিবর্তন ঃ কীভাবে শোওয়া উচিত, কীভাবে বসাা উচিত, কীভাবে গাড়ি চালানো উচিত, কোনো জিনিস মাটিতে পড়ে গেলে তা তোলার পদ্ধতি, বাচ্চাকে কোলে কীভাবে নিলে কোমরে চাপ পড়বে না ইত্যাদি।

● বসা বা দাঁড়ানোর সঠিক ভঙ্গিমা ঃ দীর্ঘক্ষণ ধরে অনেকেই ল্যাপটপে বা ডেস্কটপে কাজ করছেন, কেউ লেখালেখি করছেন বা বিভিন্ন বিপননীতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে কাজ করছেন, তাদের টানা বসে বা দাঁড়িয়ে কাজ করার ফলে সায়াটিকা নার্ভের ওপর চাপ পড়ছে,

■■

প্রাথমিক অবস্থায় ব্যথা কমানোর জন্য চিকিৎসায় যত না খরচ হয় তার থেকে অনেক বেশি খরচ হয় অবহেলা করে ব্যথা দিনের পর দিন ফেলে রাখলে বা নিজেরা ওষুধ খেয়ে কাটালে। এতে অনেকটা ক্ষতি হয়ে যাবার পর যখন তারা ডাক্তারবাবুর কাছে যান তখন রোগটা জটিল পর্যায়ে গিয়ে খরচসাপেক্ষ হয়ে ওঠে।

■■

ভার্টিব্রায় চাপ পড়ছে। এগুলোকে 'পুওর পশ্চার' বলা হয়। বসা ও দাঁড়ানোর ভুল ভঙ্গিমার কারণে ভার্টিব্রায় চাপ পড়ে তার সঙ্গে যুক্ত নার্ভ বা স্নায়ু ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ছে।

● যারা গাড়ি চালাচ্ছেন বা বাইক চালাচ্ছেন নিয়মিত অনেকক্ষণ ধরে তাদের ক্ষেত্রেও এই সমস্যা আসছে ওই একই কারণে। মনে রাখতে হবে বাইক, গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রেও একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। তার বেশি যদি চালানো হয় তাহলে এই সমস্যা আসবেই। কারণ দীর্ঘক্ষণ বসে মেরুদন্ড সোজা রেখে চালানো সম্ভব হয় না তাই তারাও এই কারণে সমস্যার মধ্যে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছেন।

■ এরপর সমস্যা একটু গভীরে গেলে ফিজিওথেরাপির সাহায্য নিতে হবে।

● কিছু ইলেকট্রোথেরাপি থাকে। এর বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। যার যে ধরনের সমস্যা তার ক্ষেত্রে সেই বপদ্ধতির সাহায্য নিতে হয়। এক্ষেত্রে ইলেকট্রিক্যাল কিছু মেশিন রয়েছে যার মাধ্যমে ব্যথা নিরাময় করা যায়। যখন রোগীর ব্যথা হচ্ছে এবং তিনি বুঝতে পারছেন যে তিনি বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে বা বসে থাকতে বা হাঁটতে পারছেন না তখন জীবনধারার পরিবর্তন করে বা ব্যায়াম করে কোনো লাভ হবে না বা করা যাবে না। এ অবস্থায় ফিজিওথেরাপির প্রয়োজন। এক্ষত্রে চিকিৎসক যখন ফিজিওথেরাপির পরামর্শ দেন তখন এই ইলেকট্রোথেরাপির সাহায্য নিতে হয়।

তারপর যখন নির্দিষ্ট কোর্স করার পর ব্যথা নিয়ন্ত্রণে আসে তখন ব্যায়াম ও অন্যান্য সাবধানতা নিতে পরামর্শ দিতে হয়।

এক্ষেত্রে ব্যথাটা কমলে তারপর আবশ্যিকভাবে দুটো জিনিস মেনে চলতে হবে—

● জীবনধারার পরিবর্তন

● শোওয়া, বসার সঠিক ভঙ্গিমা অনুসরণ করে চলা।

■ ইনভেনশন

এক্ষেত্রে পি.এম.আর ডাক্তারদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। রোগীর ব্যথা যখন বাড়াবাড়ি পর্যায়ে যায় তখন এই ডাক্তারবাবুরা অপারেশন

থিয়েটারে নিয়ে গিয়ে আধুনিক প্রযুক্তির স্ক্রিনের মাধ্যমে ওই ব্যথার জায়গায় যেখানে ডিস্ক সরে গিয়ে নার্ভ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেখানে ছুঁচ ঢুকিয়ে স্টেরয়েড ব লোকাল অ্যানাস্থেসিয়া বা ওজোন গ্যাস ভরে দেন। এটিকে ওজোন থেরাপি বলা হয়। এর মাধ্যমে ব্যথা নিরাময় করা হয়।

সবশেষে যেখানে রোগীর সায়াটিকা ব্যথা অবহেলিত হতে হতে এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যেখানে রোগী শয্যা নিয়ে নেন। এ অবস্থায় সার্জেনের কাছে তাকে পাঠানো হয় এবং মেরুদন্ডের অপারেশনের প্রয়োজন হয়। এই অপারেশন অত্যন্ত ঝুঁকির। এর থেকে প্যারাপ্লেজিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এটা হল মেরুদন্ডের ক্ষতির জন্য শরীরের নীচের অংশের পেশি দুর্বল হয়ে যাওয়ার ফলশ্রুতি পা ও শরীরের নীচের অংশের আংশিক বা সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত হওয়া।

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

এই ধরনের অসুখ থেকে বাঁচতে সময় থাকতেই কিছু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

●সচেতনতা ঃ যখন প্রথম প্রথম কোমরে হালকা ব্যথা শুরু হয় তখন থেকেই সতর্ক হতে হবে। আজকাল ৩০ পার হলেই এই সমস্যা শুরু হতে পারে। তাই এই কম বয়স থেকেই সতর্ক হওয়াটা খুব প্রয়োজন। এটা পুরুষ ও মহিলা দু'জনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কোমরের ব্যথার ধরণ অনুযায়ী সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিতে হবে।

●অ্যাকিউট পেন যদি হয় অর্থাৎ শোওয়া বা বসার ব্যায়ামের কারণে ব্যথা হলে দু'দিন গরম সেঁক বা ব্যথা নিরোধক জেল লাগাতে হবে। এতে যদি ব্যথা কমে যায় তাহলে চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু তারপরেও যদি ব্যথাটা থেকে যায় তাহলে দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতেই হবে। এখনকার দিনে দেখা যাচ্ছে অনেকেই নিজেরা ডাক্তারি করে ব্যথা কমানোর চেষ্টা করছেন। কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে তারা মাসল রিল্যাক্সেসন খেয়ে নিচ্ছেন। এটা কিন্তু অত্যন্ত ক্ষতিকর।

এক্ষেত্রে বলি, প্রাথমিক অবস্থায় ব্যথা কমানোর জন্য চিকিৎসায় যত না খরচ হয় তার থেকে অনেক বেশি খরচ হয় অবহেলা করে ব্যথা দিনের পর দিন ফেলে রাখলে বা নিজেরা ওষুধ খেয়ে কাটালে। এতে অনেকটা ক্ষতি হয়ে যাবার পর যখন তারা ডাক্তারবাবুর কাছে যান তখন রোগটা জটিল পর্যায়ে গিয়ে খরচসাপেক্ষ হয়ে ওঠে। প্রাথমিক অবস্থায় ডাক্তার দেখালে তারা হোম রেমিডিই দেন। অসুখ গভীরে গেলে চিকিৎসার খরচও সেভাবে বাড়ে।

■ ■

যাঁদের দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয় যেমন রান্না করা, সেক্ষেত্রে তাদের ১৫ মিনিট অন্তর একটু সময়ের জন্য বসতে হবে। দরকার হলে রান্নাঘরেই একটা টুল রাখুন। রান্না চাপিয়ে তাতে সামান্য সময় বসে নিন। এভাবে করলে ৩–৪ ঘণ্টা রান্না করলেও অসুবিধে হবে না। এতে কোমরের ওপর চাপ কম পড়বে।

■ ■

●আগেকার দিনে এই লো ব্যাক পেইন–এ ১০ থেকে ১৫দিন বিছানায় শুয়ে কাটাতে হত। কিন্তু এখন ৩ থেকে ৪ দিন বিশ্রাম নেওয়ার পর ক্ষমতা অনুযায়ী চলাফেরা করতে বলা হয়।

●পশ্চার কারেকশন বা শোওয়া–বসার ভঙ্গি যেন ঠিক থাকে এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

●ঝুঁকে কোনো কাজ একটানা করা চলবে না।

●ভারি জিনিস টানাটানি করবেন না বা ভারি মাল টানবেন না।

●দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে কাজ করবেন না। যাঁদের দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে কাজ করতে হয় যেমন রান্না করা, সেক্ষেত্রে তাদের ১৫ মিনিট অন্তর একটু সময়ের জন্য বসতে হবে। দরকার হলে রান্নাঘরেই একটা টুল রাখুন। রান্না চাপিয়ে তাতে সামান্য সময় বসে নিন। এভাবে করলে ৩–৪ ঘণ্টা রান্না করলেও অসুবিধে হবে না। এতে কোমরের ওপর চাপ কম পড়বে।

●ঠিক একইভাবে দীর্ঘক্ষণ এক জায়গায় বসে কাজ করবেন না। ল্যাপটপ নিয়ে যারা কাজ করেন, লেখালেখি করেন, একটানা অনেকক্ষণ বসে থাকলে কোমরের ওপর খুব চাপ পড়ে। তাদের আমরা বলি১৫–২০ মিনিট অন্তর বা খুব বেশি হলে ৩০ মিনিট অন্তর উঠে দাঁড়িয়ে একটু শরীরটাকে স্ট্রেচ করে দু'পা হেঁটে আবার বসুন।

এর বাইরে আরও একটি বিষয় থাকে সেটা হল ট্রমা। কোনো চোট লাগা, হ্যাঁচকা লাগা, সিঁড়ি থেকে পড়ে যাওয়ার ফলে এই সায়াটিকা নার্ভ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পার। সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে চিকিৎসা করতে হবে।

সবশেষে বলি, সায়াটিকা ব্যথার শুরুতেই এর চিকিৎসা শুরু করুন। তাছাড়া বসা, শোওয়ার সঠিক ভঙ্গি অনুসরণ করে চলুন তাহলে ব্যথা বাড়তে পারবে না এবং ঘরেই কিছু ব্যায়ামের মাধ্যমে এই বড়সড় বিপদ আসার আগেই শরীরটাকে ঠিক রাখতে পারবেন। সচেতন থাকুন, সুস্থ থাকুন। ❑

অনুলিখন : সুব্রতা সাহাবসু

অ্যান্টি হিস্টামিনিকস্ মুখে খাওয়ার যে সব ওষুধ তা নিয়ে এর প্রকোপ কমানো যায়। তবে এখানে বলি বছরে যদি খুব সীমিত সময়ের জন্য এই অ্যালার্জি হয় তবে এসব ওষুধে ভালো কাজ হয় বা সেরে যায়। কিন্তু যাদের সারা বছর ধরে বারংবার এই অ্যালার্জি হচ্ছে তার ক্ষেত্রে অসুবিধা হল যে তিনি কত ওষুধ খাবেন? এ অবস্থায় ওইসব রোগীকে কিছু পরীক্ষা করতে দেওয়া হয়।

কখন অ্যালার্জি সাংঘাতিক হতে পারে

'অ্যালার্জি শব্দটার সঙ্গে সাধারণ মানুষের এতটাই পরিচিতি যে কোনো ধরনের প্রাত্যহিক কথাবার্তার মধ্যে আমরা প্রায়শই এই শব্দটাকে ব্যবহার করি। কোনো কোনো সময় হাসিঠাট্টার ছলেও। চিকিৎসকের দৃষ্টিতে ব্যাপারটাতে অতটা অসহিষ্ণু না হলেও সার্বিকভাবে মেনে নেওয়া ক্রমাগত কঠিন হয়ে পড়ছে। কারণ অ্যালার্জি আজকের দিনে দাঁড়িয়েছে প্রায় মহামারির আকারে। এই বিষয়েই আজকের আলোচনা এই প্রতিবেদনে।

অ্যালার্জি কী

চিকিৎসা পরিভাষায় অ্যালার্জি হল শরীরের এমন একটা অবস্থা যেখানে শরীরের রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থা বা ইমিউন সিস্টেম একটি বাইরে থেকে শরীরে প্রবেশ করা জিনিসের প্রতি অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখায়। যে পদার্থের থেকে অ্যালার্জির সৃষ্টি তাকে অ্যালার্জেন বলে।

অ্যালার্জি কেন হয়

এখন প্রায় ঘরে ঘরে অ্যালার্জির প্রকোপ বেড়ে গেছে। সাধারণত দেখা গেছে বেশ কয়েকটি কারণে এই অ্যালার্জি হয়। যেমন—

ডাঃ প্রমিতশ্রী ভট্টাচার্য
(যক্ষ্মা বিভাগ, কলেজ অফ মেডিসিন অ্যান্ড সাগর দত্ত হসপিটাল
মোবাইল : ৯২৩১৯০২৮২৮

- পারিপার্শ্বিক পরিবেশ দূষণ।
- জীবনধারণ পদ্ধতির পরিবর্তন।
- এসির ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি।
- ঘরে উপযুক্ত আলো–বাতাসের অভাব।
- আবহাওয়ার অস্বাভাবিক পরিবর্তন।

এইসব নানা কারণে অ্যালার্জির প্রকোপ দেখতে পাওয়া যায়।

উপসর্গ

অ্যালার্জির প্রকারভেদের সঙ্গে সঙ্গে এর উপসর্গও ভিন্ন।

- হাঁচি, কাশি, নাক দিয়ে জল পড়া ইত্যাদি হল অ্যালার্জিক রাইনাইটিসের লক্ষণ।
- চুলকানি, চামড়াতে চাকা চাকা লাল দাগ ইত্যাদি ত্বকের অ্যালার্জির লক্ষণ।
- হাঁচি, কাশি, চোখ লাল হয়ে জল পড়া ইত্যাদি ডাস্ট অ্যালার্জির লক্ষণ।
- ব্যথা, লালভাব, ফুসকুড়ি পোকামাকড় থেকে অ্যালার্জির লক্ষণ।
- ফুসকুড়ি, ছত্রাক আক্রমণ, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি ড্রাগ অ্যালার্জির লক্ষণ।
- বমি, পেট ফাঁপা, ফোলাভাব, ডায়রিয়া ইত্যাদি খাবারজনিত অ্যালার্জির লক্ষণ।

এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হল অ্যালার্জি থেকে যদি শ্বাসকষ্ট হয় এবং তার সময়োপযোগী চিকিৎসা না হয় তবে তা অ্যাজমায় পরিণত হয়।

যত ধরনের অ্যালার্জি আছে তার মধ্যে ত্বকের অ্যালার্জি ও অ্যালার্জিক রাইনাইটিস সাধারণত বেশি দেখা যায়।

রোগ নির্ণয় পদ্ধতি

রোগীর সঙ্গে ভালোভাবে কথাবার্তা বলে তার রোগের একটা ইতিহাস জানতে হয়। যেমন এই অসুবিধা কতদিন ধরে হচ্ছে, কোন সময়ে এবং কতবার হচ্ছে, সারা বছর থাকে নাকি বছরের কোনো বিশেষ সময়ে এর প্রভাব লক্ষ্য

করা যায়, ওষুধ খেলে কমে যাচ্ছে কি না বা ওষুধ খেয়ে কমার পরেও আবার হচ্ছে কি না, রোগী নিজ লক্ষ করেছেন কি না যে তার কোন কোন জিনিসে অ্যালার্জি হয় ইত্যাদি। চিকিৎসা হবে সেই অনুযায়ী।

এবার আসি অ্যালার্জেন প্রসঙ্গে অর্থাৎ যার মাধ্যমে অ্যালার্জির সৃষ্টি। অ্যালার্জেন দু-প্রকারের, যেমন—

- যে বিষয়গুলোকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব।
- যে বিষয়গুলোকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বা বলা যেতে পারে যেগুলো আমাদের পরিবেশের মধ্যে ছড়িয়ে আছে।

চিকিৎসা পদ্ধতি

এক্ষেত্রে বলি অ্যান্টি হিস্টামিনিকস্ মুখে খাওয়ার যে সব ওষুধ তা নিয়ে এর প্রকোপ কমানো যায়। তবে এখানে বলি বছরে যদি খুব সীমিত সময়ের জন্য এই অ্যালার্জি হয় তবে এসব ওষুধে ভালো কাজ হয় বা সেরে যায়। কিন্তু যাদের সারা বছর ধরে বারংবার এই অ্যালার্জি হচ্ছে তার ক্ষেত্রে অসুবিধা হল যে তিনি কত ওষুধ খাবেন? এ অবস্থায় ওইসব রোগীকে কিছু পরীক্ষা করতে দেওয়া হয়। এটা হল প্রথমে—

- রক্তের আই.জি. ই লেভেল বা ইমিউনোগ্লোবিন ই লেভেল। এটির মাত্রা বয়স অনুযায়ী হয় এবং এর মাধ্যমে অ্যালার্জিক প্রতিক্রিয়া বোঝা যায়।
- স্কিন প্রিক অ্যালার্জি টেস্ট। এটা করে কী অ্যালার্জি আছে সেটা বোঝা যায়।

যে বিষয়গুলো চিহ্নিত হল তার মধ্যে যেগুলো এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব সেগুলোকে এড়িয়ে যেতে হবে। কিন্তু যেগুলো পরিবেশের মধ্যে ছড়িয়ে আছে সেগুলোর জন্য ইমিউনোথেরাপি দেওয়া হয়।

এছাড়াও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল রোগীর এই অ্যালার্জি বিষয়ক জ্ঞান। রোগীকে অ্যালার্জি কী, কীভাবে হচ্ছে এবং কী ধরনের প্রতিরোধক ব্যবস্থা তিনি নেবেন তা বুঝিয়ে দেওয়া।

অ্যালার্জির মূল ওষুধ হল খাওয়ার ওষুধ অ্যান্টি হিস্টামিনিক। যদি ফুসফুস আক্রান্ত হয় তাহলে ইনহেলার ব্যবহার করতে হবে। নাক দিয়ে যদি জল পড়ে তাহলে নাকের কিছু স্প্রে আছে যা ব্যবহার করতে হয়।

অ্যালার্জির মূল ওষুধ হল খাওয়ার ওষুধ অ্যান্টি হিস্টামিনিক। যদি ফুসফুস আক্রান্ত হয় তাহলে ইনহেলার ব্যবহার করতে হবে। নাক দিয়ে যদি জল পড়ে তাহলে নাকের কিছু স্প্রে আছে যা ব্যবহার করতে হয়।

ওষুধ কতদিন খেতে হবে

ওষুধ দেওয়া হয় অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে রোগীকে কিছুটা স্বস্তি দেওয়ার জন্য। তবে সারা বছর যদি রোগী এ ধরনের অস্বস্তিকর অবস্থায় ভোগেন বা কিছুদিন ওষুধ ব্যবহার করার পরেও যদি তার অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন না হয় তখন অন্য চিকিৎসার কথা ভাবা হয়। এ অবস্থায় অ্যালার্জি স্পেসিফিক ইমিউনোথেরাপির চিকিৎসা করা হয়।

কার এই পদ্ধতি প্রয়োজন, কীভাবে বোঝা যাবে

এক্ষেত্রে হয়তো ভাবতে পারেন কার এই ইমিউনোথেরাপি প্রয়োজন? সেক্ষেত্রে বলি আগে রোগীকে যে স্কিন প্রিক টেস্ট করানো হয়েছিল যার মাধ্যমে তার অ্যালার্জেনগুলো চিহ্নিত করা গিয়েছিল সেসবের জন্যই অ্যালার্জিজনিত ইমিউনোথেরাপি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

কীভাবে এই চিকিৎসা হবে

এই থেরাপি নিতে থাকা রোগীর শরীরে তাদের অ্যালার্জেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। এতে ইমিউন সিস্টেমের প্রতিক্রিয়া কমে গিয়ে অ্যালার্জির প্রবণতা কমিয়ে দেয়।

- প্রথম কিছুদিন স্প্রে দেওয়া হয়।
- এরপর ইমিউনোথেরাপি শুরু করা হয়।

এই থেরাপি দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে অর্থাৎ এক থেকে দু'বছর নিলে সারা জীবনের মতো অ্যালার্জির অস্বস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

- মূলত ড্রপের বা ফোঁটার আকারে দেওয়া হয়।
- কারো কারো ক্ষেত্রে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমেও দেওয়া হয়।

এর মধ্যে ড্রপের আকারে যে ওষুধটা মুখে দেওয়া হয় তা বেশি গ্রহণযোগ্য কারণ এটা রোগী বাড়িতেই দিতে পারবেন। এই ওষুধটি ফ্রিজে সংরক্ষণ করে রাখা যায়।

সবশেষে বলি অ্যালার্জি বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে ভাবুন। অবহেলা করবেন না। কারণ এই অস্বস্তিকর অবস্থা মানুষকে ক্রমাগত দুর্বল করে দেয়। সময়মতো চিকিৎসা না হলে জীবন সংশয় হওয়াটা কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। সুতরাং অ্যালার্জি কোনো হেলাফেলার বিষয় নয়। ❑

অনুলিখন : সুব্রতা সাহা বসু

কনট্যাক্ট লেন্সের সমস্যা

ডাঃ সোহম বসাক
(কর্নিয়া বিশেষজ্ঞ, দিশা আই হসপিটাল)
মোবাইল : ৯১৫৯০৬৮৫৮২

তথ্যপ্রযুক্তির কর্মী রিমা। দীর্ঘদিন কনট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করছেন। ইদানীং হয়েছে এক সমস্যা। লেন্স পরলেই চোখ এক ঘণ্টার মধ্যে লাল। চোখের ভিতর অদ্ভুত অস্বস্তি। যতক্ষণ না লেন্স খুলছেন, ততক্ষণ স্বস্তি নেই।

স্কুল শিক্ষক অলোক। তিনি চশমা না পরেই স্বচ্ছন্দ ছিলেন। নিয়মিত ব্যবহার করতেন কনট্যাক্ট লেন্স। এখন আলোর দিকে তাকাতেই সমস্যা হচ্ছে। কনট্যাক্ট লেন্স পরলে চোখ থেকে অনবরত জল পড়ছে।

দীর্ঘদিন কনট্যাক্ট লেন্স ব্যবহারে এমন সমস্যা অনেকেরই হয়। এর কোনও কোনওটি তো বেশ সাধারণ সমস্যা। ঠিকভাবে লেন্স ব্যবহার করা ও কিছু নিয়ম মানলেই মেলে সমস্যা থেকে রেহাই।

কনট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করলে ঠিক কী কী সমস্যা ভোগাতে পারে আপনাকে? সেগুলির কোনটি গুরুতর আর কোনটি ঠিকমতো আইড্রপেই সেরে যায়, এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

● সময়সীমার বেশি সময় ধরে কনট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করলে অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা হয়।

● ঠিক মতো ফিট না করলে, কেস বা সলিউশন পরিস্কার না থাকলে বা নিয়মিত সলিউশন না বদলালে ইনফেকশন অবধি হতে পারে।

● অনেকক্ষেত্রে নখের খোঁচায় চোখ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে লেন্স পরতে গিয়ে।

● অপরিস্কার হাতে লেন্স পরলেও চোখে ইনফেকশন ছড়াতে পারে।

● কনট্যাক্ট লেন্স কেসের জল নিয়মিত না বদলালে বিপদ হতে পারে।

কনট্যাক্ট লেন্স ব্যবহারে সঠিক নিয়ম না মানলে কী কী সমস্যা আসতে পারে

● চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়া।

● চোখ চুলকানো।

● পিচুটি পড়া।

● আলোর দিকে তাকাতে না পারা।

● চোখ লাল হয়ে কনজাংটিভাইটিসের মতো হয়ে যাওয়া।

● কখনও কখনও আবার চোখ শুকিয়ে যাওয়া।

কোন সমস্যার কী সমাধান

● **ড্রাই আই** : দীর্ঘদিন কনট্যাক্ট লেন্স ব্যবহারে চোখের জল শুকিয়ে যাওয়ার মতো অস্বস্তি হয়। এক্ষেত্রে খুব বেশিক্ষণ লেন্স ব্যবহার চলবে না। লুব্রিকেটিং ড্রপ ব্যবহার করতে হবে নিয়ম মতো। তাহলে সমস্যার সমাধান হবে।

● **জায়ান্ট প্যাপিলারি কনজাংট–ভাইটিস** : এই সমস্যা হতে পারে লেন্সের ফিটিংসে সমস্যা থাকলে। এতে চোখ চুলকোয়। এক্ষেত্রেও সলিউশন ওষুধ ও আইড্রপ। চোখে অস্বস্তি হলে কনট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করা কিছুদিন বন্ধ রাখতে হবে।

● **চোখের ওপরের লেয়ার** ছড়ে গিয়ে সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই ঘটনা ঘটতে পারে নানা কারণে। আঙুল লেগে বা অন্য কোনও কারণে ছিড়তে পারে পাতলা লেয়ার । চোখ বেশি চুলকোতে গিয়েও সমস্যা হতে পারে। নির্দিষ্ট আইড্রপের ব্যবহারে সেরে যায়। সলিউশন দূষিত হলেও হতে পারে এমন সমস্যা।

● আলোর দিকে তাকাতেই অসুবিধা হতে পারে। কিছুদিন লেন্স ব্যবহারে বিরতি দিলেই সমস্যা কমতে পারে। সঙ্গে দরকার আই ড্রপ।

● কর্নিয়াল আলসার হলে একটু বেশি চিন্তার। জীবাণু থেকে চোখের মণিতে সংক্রমণ হতে পারে। এক্ষেত্রে ওষুধে কাজ না হলে অস্ত্রোপচারও করতে হতে পারে। সেরে গেলেও এর থেকে আংশিক দৃষ্টিহীনতা আসতে পারে।

সমস্যা এড়িয়ে চলতে হলে

● লেন্স পরা বা খোলার আগে হাত পরিস্কার করুন।

● লেন্স পরে স্নান করবেন না।

● লেন্স পরে ঘুমোবেন না।

● কারও সঙ্গে লেন্স শেয়ার করবেন না।

● লেন্সের কেস রোজ ভাল করে ধুতে হবে।

● লেন্সের কেস তিন মাস অন্তর বদলে ফেলুন।

● লেন্সের জলও বদলাতে হবে নিয়ম মেনে।

● নিজে থেকে স্টেরয়েড ড্রপ ব্যবহার কখনওই করবেন না। ❑

অ্যানিমিয়ার চিকিৎসা না করালে তা হৃদযন্ত্রের গোলযোগ ঘটাতে পারে। হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কম হওয়ার ফলে রক্তের অক্সিজেন বহন ক্ষমতা কমে যায়। এতে হার্টের কাজ বেড়ে যায়। ক্রমশ হার্টের আকারও বৃদ্ধি পায়। ধীরে ধীরে ইস্কিমিয়া হার্ট ফেলিওর অবধি হতে পারে।

অ্যানিমিয়া থেকে মুক্তি

ডাঃ তুফান কান্তি দোলই
(রুবী জেনারেল হসপিটাল)

রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। যদিও সাধারণ মানুষ প্রাত্যহিক জীবনে এই সমস্যাকে তেমন গুরুত্ব দিতে চান না।

অ্যানিমিয়ার প্রথম ও প্রধান কারণ অপুষ্টি। অপুষ্টি ছাড়াও অন্য অনেক কারণ আছে। আমাদের দেশে অ্যানিমিয়া দেখা যায় মূলত শিশু, মহিলা, অন্তঃস্বত্বা মহিলা এবং বয়স্ক মানুষের মধ্যে।

যেকোনো সুস্থ সবল পুরুষদের প্রতি ১০০ মিলি রক্তে হিমোগ্লোবিনের সঠিক পরিমাণ ১৪ থেকে ১৬ গ্রাম হওয়া উচিত। মহিলাদের ক্ষেত্রে তা ১২-১৪ গ্রাম। হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ এর থেকে কম হলে অ্যানিমিয়ার সূত্রপাত হয়। আমাদের শরীরের যাবতীয় অঙ্গকে পুষ্টি ও অক্সিজেন সরবরাহ করে বাঁচিয়ে রাখে রক্ত। অত্যন্ত জটিল এক পদ্ধতিতে বেশ কয়েকটি ধাপে অস্থিমজ্জা বা বোনম্যারো থেকে রক্ত তৈরি হয়। রক্ত তৈরির এই পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক নাম হেমাটোপায়োসিস। রক্তের রঙকে লাল করে লোহিত কণিকা। এই লোহিত রক্তকণিকার মধ্যে হিমোগ্লোবিন নামে একটি লোহাযুক্ত প্রোটিন থাকে। তার জন্যই রক্তের রঙ হয় লাল।

রক্তের অন্যতম কাজ কোষে কাষে অক্সিজেন সরবরাহ করা ও কার্বন ডাই-অক্সাইডকে বার করে দেওয়া। আর এটা মূলত হিমোগ্লোবিনই করে। হিমোগ্লোবিন কমে গেলেই অ্যানিমিয়া হয়।

অ্যানিমিয়ার কারণগুলোকে সংক্ষেপে চিহ্নিতকরণ

- হিমোগ্লোবিন তৈরিতে কোনোরকম ত্রুটি।
- অপুষ্টি।
- রক্তক্ষয়।
- বোনম্যারো ফেলিওর।
- শরীরের মধ্যে রক্ত তৈরি হলেও অজ্ঞাত কোনও কারণে ভেঙে যাওয়া।
- কিডনি ফেলিওর।
- অপুষ্টি, খাদ্যে ভিটামিনযুক্ত খাবারের অভাব।
- কিছু নির্দিষ্ট রোগের কারণে শরীরে রক্তক্ষরণ হয়। এগুলো থেকেও হতে পারে অ্যানিমিয়া। যেমন পেটের আলসার, পাইলস, হুকওয়ার্ম ইনফেকশন। এছাড়া মহিলাদের অত্যধিক রজঃস্রাব।
- শরীরে আঘাত লেগে অনেকক্ষণ রক্তক্ষরণ হলেও হতে পারে অ্যানিমিয়া।
- গর্ভবতী মহিলাদের বাচ্চা হওয়ার সময় বা প্রসবকালীন অবস্থায় খুব বেশি রক্তপাত হলে তা থেকে অ্যাকিউট অ্যানিমিয়া হতে পারে।
- শরীরে আয়রন, ফোলিক অ্যাসিড ইত্যাদির পরিমাণ কমে গিয়ে ক্রনিক অ্যানিমিয়া হতে পারে।
- থ্যালাসেমিয়া রোগে মানবদেহে ঠিকঠাক রক্ত তৈরি হয় না। ফলে এই রোগে আক্রান্ত মানুষের রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া দেখা দেয়।
- রক্তাল্পতার আর একটি গুরুত্বপূণ কারণ হল গ্যাসট্রিক আলসার। এমনিতে ক্যানসার রোগে বমির সঙ্গে রক্ত বের হতে পারে যা খালি চোখে দেখা যায়। কিন্তু কোলন ক্যানসার হলে মলের সাথে রক্ত বের হয় যা খালি চোখে দেখা যায় না। এভাবে চলতে থাকলে শরীরে আয়রনের অভাবে অ্যানিমিয়া দেখা দেয়।
- একাধিকবার বা অধিকবার গর্ভবতী হওয়ার কারণে পর্যাপ্ত আয়রনের ঘাটতি দেখা দিলে অ্যানিমিয়া দেখা যায়।

আসলে দেখতে গেলে হাজারো একটা কারণ থাকতে পারে অ্যানিমিয়া হবার জন্য।

অ্যানিমিয়ার উপসর্গ

শ্বাসকষ্ট, মাথা ঝিম ঝিম করা, বুকে ব্যথা, খুব দুর্বল বোধ করা, হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। আসলে অ্যানিমিয়ার উপসর্গগুলোকে সাধারণভাবে নির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। খিদে কমে যাওয়া, দুর্বল বোধ করা, মাথা ব্যথা, প্যালপিটিশন, শরীর ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া, বেশি ঘুম পাওয়া, এমনকী হার্ট বিট বেড়ে যাওয়াও অ্যানিমিয়ার কারণে হতে পারে।

অ্যানিমিয়া শরীরে আছে কি না জানতে প্রধানত দু' ধরনের পরীক্ষা করা হয়— পেরিফেরাল ব্লাডস্মিয়ার এবং কমপ্লিট হিমোগ্রাম। ঠিক কোন কারণে অ্যানিমিয়া হয়েছে তা বুঝতে পেরিফেরাল ব্লাডস্মিয়ার পরীক্ষা খুব জরুরি। অনেক সময় অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পরেও রোগীর দেহে অ্যানিমিয়ার কারণ ধরা যায় না। সেক্ষেত্রে অন্য কোনো রোগ থেকে অ্যানিমিয়া হয়েছে কি না তা জানতে চিকিৎসকরা বেশ কিছু বিশেষ রোগ পরীক্ষার নির্দেশ দেন। মূলত টিউবারকুলোসিস, কিডনির অসুখ, লিভারের রোগ আছে কি না জানতে পরীক্ষা করা হয়।

অ্যানিমিয়া কতটা মারাত্মক

সাধারণভাবে অ্যানিমিয়াকে ততটা গুরুত্ব দেওয়ার মতো মনে না হলেও অ্যানিমিয়া থেকে ভবিষ্যতে অনেক মারাত্মক রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। হার্ট ফেলিওর, হেমারেজ, জনডিস, থ্যালাসেমিয়ার কারণে শরীরে বিকৃতি আসা, পায়ে ও পেটে আলসারের সমস্যা ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। এই সমস্যাগুলো আরও জটিল হয় কারো ম্যালেরিয়া, টিবি, ব্লাড ক্যানসার বা ম্যালিগন্যান্সি থাকলে। তাই অ্যানিমিয়া হলে অবহেলা না করে চিকিৎসককে দেখিয়ে পরামর্শ নেওয়া দরকার।

গর্ভবতী মহিলাদের শরীরে রক্তের ঘাটতি হলে অনেক সময় প্রাণ সংশয় হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই গর্ভাবস্থায় মায়ের শরীরে অ্যানিমিয়া রয়েছে কি না তা নিশ্চিত হওয়া দরকার।

অ্যানিমিয়া বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। তার মধ্যে প্রাত্যহিক জীবনে যেগুলো দেখা যায়— সিকল সেল অ্যানিমিয়া, হিমোলিটিক অ্যানিমিয়া, অ্যাপ্লাসটিক অ্যানিমিয়া, পেনিসিয়াস অ্যানিমিয়া ও থ্যালাসেমিয়া। এছাড়া মেগালোপ্লাসটিক অ্যানিমিয়া, ম্যাক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়াও দেখা যায়।

সিকল সেল অ্যানিমিয়া

থ্যালাসেমিয়ার মতোই বিটা গ্লোবিন জিনের মিউটেশনের ফলে সৃষ্ট একটি রোগ। এই রোগের কারণে যে লেহিত কণিকা তৈরি হয় তা সিকল বা কাস্তের আকার ধারণ করে। সাধারণত লোহিত কণিকার গড় আয়ু ১২০ দিন, কিন্তু সিকল সেল অ্যানিমিয়ার ক্ষেত্রে লোহিত কণিকা ১০-১২ দিন বাঁচে। তাই এই রোগের ক্ষেত্রে রক্তস্বল্পতা দেখা যায়। আর এই কারণে রোগটিকে সিকল সেল অ্যানিমিয়া বলে। এরকম ক্ষেত্রে রোগীর ত্বক ফ্যাকাসে হয়ে যায়। ঝিমুনি ভাব, মাথার যন্ত্রণা, হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যাওয়া এই রোগের লক্ষণ। এছাড়া রোগীর শরীরে বিভিন্ন অঙ্গ-

খিদে কমে যাওয়া, দুর্বল বোধ করা, মাথা ব্যথা, প্যালপিটিশন, শরীর ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া, বেশি ঘুম পাওয়া, এমনকী হার্ট বিট বেড়ে যাওয়াও অ্যানিমিয়ার কারণে হতে পারে।

প্রত্যঙ্গ যেমন পেট, হাড়ের গাঁটে ব্যথা হয়। এই ধরনের রোগ ওড়িশা অঞ্চলে ও উপজাতিদের মধ্যে বেশি দেখা যায়।

অ্যাপ্লাসটিক অ্যানিমিয়া

বিশেষ কিছু অসুখ-বিসুখ এবং ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবে বোনম্যারো থেকে লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদনের হার ভীষণভাবে কমে যেতে পারে অথবা একেবারে বন্ধও হয়ে যেতে পারে। পাশাপাশি শ্বেতরক্তকণিকা ও অনুচক্রিকা বা প্লেটলেটের উৎপাদন যদি কমে যায় তবে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ব্যাহত হয়। উপরন্তু দেহের বিভিন্ন ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাতের প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় অবস্থা জটিল হয়ে ওঠে। সময় মতো ব্লাড ট্রান্সফিউশন করা না গেলে বিপদ হতে পারে।

পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়া

মাঝবয়স থেকে বৃদ্ধাবস্থা পর্যন্ত মানুষের মধ্যে এই ধরনের অ্যানিমিয়ার প্রবণতা খুব বেশি। পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়াতে বোনম্যারো থেকে লোহিত রক্তকণিকার হার অনেক কমে যায়। ভিটামিন বি$_{১২}$-এর শোষণ ভীষণভাবে ব্যাহত হয়। ফলে ক্লান্তি, অবসাদ, দুর্বলতা, মুখে ঘা, গলা-বুক শুকিয়ে যাওয়া, মাথা ঘোরা, হাত-পা ঝিমঝিম করা, ডায়রিয়ার সমস্যা প্রায়ই লেগে থাকে। সময়মতো চিকিৎসা না হলে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র পর্যন্ত আক্রান্ত হতে পারে। হাঁটা চলার অক্ষমতা এমনকী সম্পূর্ণ পঙ্গু হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। পারনিসিয়াস অ্যানিমিয়ার রোগীদের ভিটামিন বি$_{১২}$, ফোলিক অ্যাসিড ও ভিটামিন-সি ও প্রোটিনযুক্ত খাবার প্রয়োজন।

থ্যালাসেমিয়া

অনেকের ধারণা অ্যানিমিয়ার কারণে থ্যালাসেমিয়া হয়। আসলে কিন্তু তা নয়। থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণে মানবদেহে রক্ত তৈরি হয় না। ফলে এই রোগে আক্রান্ত মানুষের অ্যানিমিয়া দেখা দেয়।

থ্যালাসেমিয়া রোগটি জিনঘটিত। জিনের প্রভাবে কারো কারো শরীরে স্বাভাবিকভাবে রক্ত তৈরি হয় না অর্থাৎ রক্তের লোহিত রক্তকণিকা তৈরি হয় না। আবার তৈরি হলেও বার বার তা ভেঙে যায়। যার ফলে শরীরে অ্যানিমিয়া দেখা দেয়।

যেসব থ্যালাসেমিয়া রোগীর বাবা ও মা দু'জনেই থ্যালাসেমিয়ার বাহক অর্থাৎ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দুটি জিনেই সমস্যা দেখা যায়, একমাত্র তাদেরই রক্ত তৈরিতে সমস্যা দেখা দেয়।

থ্যালাসেমিয়া রোগীদের নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর রক্ত দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। তাও সবসময় সাফল্য মেলে না। বড়জোর পঁচিশ থেকে ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। তাই বিয়ের আগে প্রতিটি ছেলে-মেয়ের উচিত রক্ত পরীক্ষা করে জেনে নেওয়া থ্যালাসেমিয়ার বাহক কি না। (যদি পাত্র বা পাত্রী থ্যালাসেমিয়ার বাহক হয় তাহলে তার উচিত পার্টনার যেন থ্যালাসেমিয়ার বাহক না হয় এরকম সম্পর্কে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া।)

তাই সন্তানের যাতে থ্যালাসেমিয়ার মতো

রোগ না হয় তার জন্য বিয়ের আগে পাত্র-পাত্রীর থ্যালাসেমিয়া স্ক্রিনিং পরীক্ষা অত্যন্ত জরুরি।

মেগালোব্লাসটিক অ্যানিমিয়া

নিম্নবিত্ত পরিবারে গর্ভবতী মহিলা ও শিশুর মধ্যে এই অ্যানিমিয়া দেখা যায়। গর্ভাবস্থায় যে পরিমাণ ব্যালেন্সড ডায়েট দরকার ঠিক সেই পরিমাণ ব্যালেন্সড ফুড না খাওয়ার কারণে মা ও শিশুকে কিছুদিন আগেও অপুষ্টি ও রক্তাল্পতায় ভুগতে দেখা যেত। বর্তমানে এই অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। নিয়মিত আয়রন ট্যাবলেট ও ওষুধ এখন সব হাসপাতাল ও গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দেওয়ার ফলে মা ও শিশুর মৃত্যুর হার আগের থেকে অনেক কম। গর্ভাবস্থায় মেগালোব্লাসটিক অ্যানিমিয়ার কারণে অপুষ্ট, কম ওজনযুক্ত বিকলাঙ্গ জড়বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর জন্ম হতে পারে। এমনকী হতে পারে মা ও গর্ভস্থ শিশুর মৃত্যু।

ম্যাক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া

ফোলিক অ্যাসিড থেকে ফোলিনিক অ্যাসিডে রূপান্তরকরণের কাজে বিঘ্ন ঘটলে একেবারে ছোট শিশুদের দেহে ম্যাক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়ার প্রকোপ ঘটতে দেখা যায়। যেহেতু এই রূপান্তরের কাজে ভিটামিন-সি'র ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ, তাই ছোট শিশুদের মুসম্বির রস বা কমলালেবুর রস খাওয়ানো জরুরি। সাধারণত স্কার্ভি রোগে আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে এই রোগ দেখা যায়। ছ' মাস বয়সের পর থেকে ভাত, ডাল, ছাতু, আপেল, কলা, টমেটো, বিনস্, গাজর, বীট, আলু, ডিম, মাছ, মাংসের মেটে হজমশক্তির মাত্রামাফিক দেওয়া গেলে ম্যাক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া প্রতিরোধ করা যায়।

হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া

ক্যানসার, টিবি, লিউকোমিয়া, পাইলস্, থ্যালাসেমিয়ার মতো রোগে দীর্ঘদিন ধরে ভুগতে থাকলে লোহিত রক্তকণিকা ও হিমোগ্লোবিনের উৎস কোষগুলো নষ্ট হয়ে যায়। রোগীর অ্যানিমিয়ার সঙ্গে জনডিসও দেখা দেয়। পিলে বড় হয়। এক্ষেত্রে ব্লাড ট্রান্সফিউশন করা জরুরি।

সাবধানতা

অ্যানিমিয়া মানেই কিন্তু যথেচ্ছ আয়রন ট্যাবলেট খেয়ে ফলা নয়। অতিরিক্ত আয়রনের কারণে শরীরে ইরিটেশন, কনস্টিপেশন, ডায়রিয়া ছাড়া হার্টের সমস্যাও হতে পারে।

আয়রন সমৃদ্ধ খাদ্যবস্তু দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় থাকা দরকার। চাল, বিভিন্ন ধরনের ডাল, সোয়াবিন, বরবটি, রাজমা, মটরশুটিতে যথেষ্ট আয়রন থাকে। প্রায় সব ধরনের ফলে থাকে ভিটামিন-সি।

ক্রনিক অ্যানিমিয়া থাকলে টিবি বা অন্য যেকোনো অসুখের সংক্রমণের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায়। অ্যানিমিয়ার ফলে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারেই কমে যায়।

চিকিৎসা

অ্যানিমিয়ার চিকিৎসা না করালে তা হৃদযন্ত্রের গোলযোগ ঘটাতে পারে। হিমোগ্লোবিনের মাত্রা কম হওয়ার ফলে রক্তের অক্সিজেন বহন ক্ষমতা কমে যায়। এতে হার্টের কাজ বেড়ে যায়। ক্রমশ হার্টের আকারও বৃদ্ধি পায়। ধীরে ধীরে ইস্কিমিয়া হার্ট ফেলিওর অবধি হতে পারে।

যে কারণে অ্যানিমিয়া হয়েছে তা জেনে চিকিৎসা করতে হবে। না জেনে দুমদাম ওষুধ খাওয়া ঠিক নয়।

অ্যানিমিয়ার চিকিৎসা আয়রন সাপ্লিমেন্ট, ভিটামিন-বি$_{১২}$, ফোলিক অ্যাসিড দিয়ে করা হয়। রক্ত দেওয়া অর্থাৎ ব্লাড ট্রান্সফিউশন অ্যানিমিয়ার চিকিৎসা নয়। এটা করা হয় রোগীকে সাময়িকভাবে সামলাবার জন্য। যদি শরীর থেকে হঠাৎ অনেক রক্ত বেরিয়ে যায় বা হিমোগ্লোবিনের মাত্রা অস্বাভাবিকভাবে কমে যায় তখন।

ডায়েট

অ্যানিমিয়া হলে শুধু চিকিৎসকের পরামর্শ নিলেই হবে না। একে প্রতিরোধ করার জন্য নিজেকেও অনেকটা সতর্ক থাকতে হবে। এই রোগের একটি বড় ওষুধ হল আদর্শ ডায়েট। যা মেনে চললে এই সমস্যাকে অনেকটাই প্রতিরোধ করা যায়। তাই খাদ্য তালিকায় নজর দিতে হবে। কী খাবেন, আর কী খাবেন না সেটা ভালোভাবে জানা দরকার। মোচা, থোড়, ছোট মাছ, ডুমুর, সবুজ সবজি, কুলেখাড়া, বাদাম, খেজুর, দেশি কলা নিয়মিত খেলে উপকার হবে।

আয়রন সমৃদ্ধ খাদ্যবস্তু দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় থাকা দরকার। চাল, বিভিন্ন ধরনের ডাল, সোয়াবিন, বরবটি, রাজমা, মটরশুটিতে যথেষ্ট আয়রন থাকে। প্রায় সব ধরনের ফলে থাকে ভিটামিন-সি।

তবে থ্যালাসেমিয়া রোগীদের যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে। কারণ থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্তদের শরীরে আয়রনের পরিমাণ স্বাভাবিকের থেকে বেশি হয়ে গেলে হিতে বিপরীত হবে। ❑

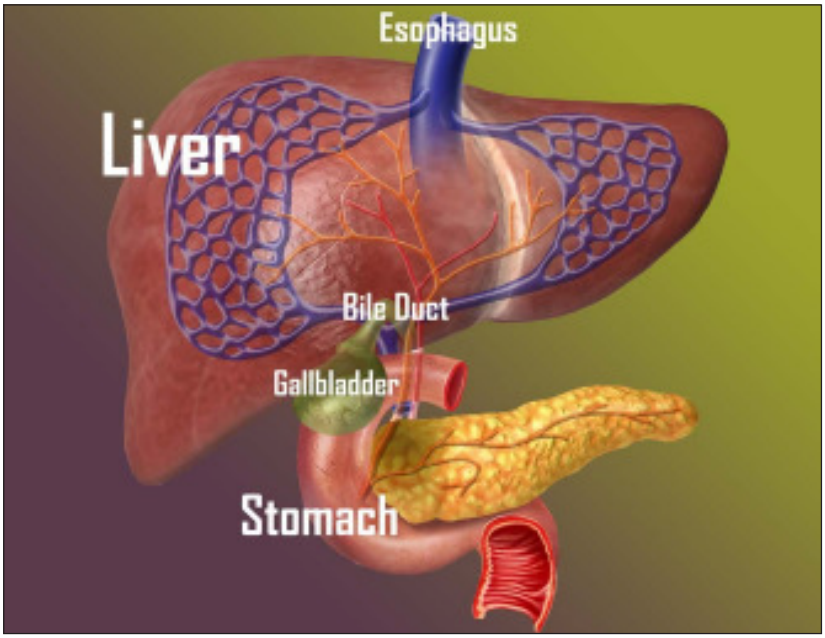

পিত্তনালীতে বাধা বিপজ্জনক হতে পারে

ডাঃ সঞ্জয় ব্যানার্জি
(গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট, আই.এল.এস. হসপিটাল)
মোবাইল : ৯৮৩০১২৯৮৬৬

বাইল ডাক্টকে বাংলা করলে কথাটা হয় পিত্তনালী। এই নালীটির মাধ্যমে লিভার ও গলব্লাডার থেকে পিত্তটা খাদ্যনালীতে পড়ে।

আমাদের পিত্তটা লিভার থেকে তৈরি হয় এবং জমা হয় গলব্লাডারে। যখন আমরা খাবার খাই, গলব্লাডারে জমা হওয়া ঘন পিত্ত বাইল ডাক্ট বা পিত্তনালী বরাবর এসে খাদ্যনালীতে পড়ে।

পিত্তনালীর কাজ হচ্ছে পিত্তটাকে লিভার তথা গলব্লাডার থেকে খাদ্যনালীতে এনে ফেলা যাতে পিত্তটা খাবারের সাথে মিশে খাবারটাকে হজম করতে সাহায্য করে।

পিত্ত বা বাইল আমাদের খাদ্যের ফ্যাট অংশ এবং খাদ্যের ফ্যাট সলিবিউল ভিটামিনকে হজম করতে সাহায্য করে।

বাইল ডাক্টের অবস্ট্রাকশন মানে ওই ডাক্ট বা নালীতে বাধা আসে, অবস্ট্রাকশন হয়।

অবস্ট্রাকশন কেন হয়

অবস্ট্রাকশন হতে পারে যখন কারো গলব্লাডারের পাশাপাশি বাইল ডাক্টে স্টোন হয়।

আজকাল গলব্লাডারে স্টোন হওয়াটা খুবই কমন, বেড়ে যাচ্ছে। কারণ ওবেসিটি বাড়ছে, কোলেস্টেরলের অসুখ বাড়ছে, ডায়াবেটিস বাড়ছে, তার সাথে গলব্লাডারে স্টোনও বাড়ছে। একশোজন গলব্লাডার স্টোনের রোগীর মধ্যে দশ জনের স্টোনের টুকরো গলব্লাডার থেকে খসে এসে পিত্তনালী বা বাইল ডাক্টে আটকে যায়। একে বলা হয় বাইল ডাক্ট স্টোন।

সাধারণত প্রাইমারিভাবে বাইল ডাক্টে স্টোনহয় না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গলব্লাডার থেকেই আসে। এবং সেটা ব্লক হয়ে অবস্ট্রাকশন হতে পারে। এটাই হল বাইল ডাক্ট অবস্ট্রাকশনের খুবই কমন কারণ। বাইল ডাক্ট অবস্ট্রাকশনের এছাড়া আরো কিছু কারণ আছে।

বাইল ডাক্টে টিউমার হয়। বাইল ডাক্ট যেখানে ক্ষুদ্রান্ত্র বা ডিওডেনামে মিশছে সেখানে যদি ডিওডেনাম টিউমার হয় বা বাইল ডাক্ট ক্ষুদ্রান্ত্রে মেশার আগে প্যাংক্রিয়াসের মাথার মধ্যে দিয়ে আসে সেই প্যাংক্রিয়াসের হেড বা মাথায় যদি টিউমার বা ক্যানসার হয়, তবে বাইল ডাক্টে অবস্ট্রাকশন হয়ে থাকে।

বাইল ডাক্ট অবস্ট্রাকশনের কারণ

■ স্টোন।

■ বাইল ডাক্টের টিউমার বা খাদ্যনালীর টিউমার ও প্যাংক্রিয়াসের টিউমার। এর জন্য অনেক সময় বাইল ডাক্ট অবস্ট্রাকশন হতে পারে।

■ কিছু কিছু জিনিস আছে যেমন ক্রনিক প্যাংক্রিয়াটাইটিস, এই কারণে বাইল ডাক্ট শুকিয়ে যেতে পারে বা স্ট্রিকচার অর্থাৎ ন্যারো বা সরু হয়ে যায়। তখন অবস্ট্রাকশন হতে পারে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে গলব্লাডার অপারেশনের পর বাইল ডাক্টে স্ট্রিকচার হয় বা সরু হয়ে যায় ।

এছাড়া কিছু প্যারাসাইট বা পরজীবী আছে যার সংক্রমণে পিত্তনালীর নীচের দিকে বা বাইল ডাক্টের নীচের দিকে সরু হয়ে যায়। এর কারণে অবস্ট্রাকশন হতে পারে।

■রাউন্ড বা গোলকৃমি যেগুলো শ্বাসনালীতে ঢুকে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। সেই গোল কৃমিও বাইল ডাক্টে ঢুকে অবস্ট্রাকশন করতে পারে।

■জন্মগত কিছু কিছু কারণ থাকে যার কারণে বাইল ডাক্ট অবস্ট্রাকশন হতে পারে বা ব্লকড হয়। তাকে বলা হয় কোলেরেক্টাল সিস্ট। বাইল ডাক্টটা সিস্টের মতো ফুলে যায় কিন্তু নীচের দিকে ড্রেনেজ হয় না, ফুলতে ফুলতে অবস্ট্রাকশন হয়।

মোট কথা, অবস্ট্রাকশন হওয়ার পিছনে পাঁচটি কারণ—

- স্টোন।
- টিউমার।
- স্ট্রিকচার বা ন্যারো বা সরু হয়ে যাওয়া বাইল ডাক্ট।
- কৃমি।
- জন্মগত কারণ।

স্ট্রিকচারের আবার অনেক কারণ আছে—

- ক্রনিক প্যাংক্রিয়াটাইটিসের স্ট্রিকচার।
- অপারেশনের পরে স্ট্রিকচার।
- রেডিওথেরাপি বা রেডিয়েশনের কারণে স্ট্রিকচার।
- কোনো আঘাত বা ইনজুরির কারণে স্ট্রিকচার।
- কোনো প্যারাসাইটিক সংক্রমণের কারণে স্ট্রিকচার।

এটা কোলেরেক্টাল সিস্ট। এটা জন্মগত ডিফেক্ট। সাধারণত দ্বিতীয়, তৃতীয় দশকে গিয়ে লক্ষণ দেখা যায় ।

বাইল ডাক্টে যদি অবস্ট্রাকশন হয় তাহলে পিত্তটা এসে খাদ্যনালীতে পড়বে না, ফলে পিত্তটা লিভারের মধ্যে জমে যাবে। লিভার থেকে ব্লাডে আসবে। ব্লাডে এসে শরীরের সব জায়গায় ছড়িয়ে যাবে। তখন স্কিনে, চোখে ইত্যাদি জায়গায় জমবে। ফলে চিকিৎসকরা বলবেন জনডিস হয়েছে। অর্থাৎ বিলিরুবিন বাড়বে। ব্লাডে বাড়বে, শরীরে বাড়বে। চোখ হলুদ হবে, প্রস্রাব হলুদ হবে। পিত্তটা খাবারের সাথে মিশতে পারবে না, ফলে স্টুল বা পায়খানা সাদা হবে। কারণ পিত্ত আসে বলেই আমাদের স্টুল হলুদ রঙের হয়।

চোখ হলুদ, ব্লাডে বিলিরুবিনের মাত্রা বেশি, ঘন হলুদ প্রস্রাব।

এক্ষেত্রে প্রস্রাব সাদা না হয়ে বেশি হলুদ হয়ে যায়। স্টুলটা হলুদ না হয়ে সাদা হয়ে যায়। এটাই হল জনডিস। এই জনডিসকে বলে অবস্ট্রাকটিভ জনডিস। অবস্ট্রাকশনের কারণে এই জনডিস হয়।

জনডিসের জন্য যে সব লক্ষণ আছে সেগুলো হল ক্ষুধামান্দ্য, বমি, গা গোলানো, পেটভার। কারো কারো ক্ষেত্রে বিলিরুবিন চামড়ায় জমা হয়, সেক্ষেত্রে চুলকানি হয়, স্কিনে র‍্যাশের মতো হয়ে চুলকোয়। কিছু সমস্যা অবস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে দেখা যায়। শরীরের কোথাও অবস্ট্রাকশন হলে সংক্রমণ হয়। বাইল ডাক্টের ক্ষেত্রে সেই অবস্ট্রাকশনটাকে বলা হয় কোলানজাইটিস বা জোলাঞ্জাইটিস। কোলাঞ্জাইটিস খুব মারাত্মক। কারণ পিত্তনালীর সংক্রমণ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ যেমন কিডনি, লাংস ইত্যাদিকে ড্যামেজ করতে পারে। কোলাঞ্জাইটিস হলে জ্বর আসে এবং এমনকী মাল্টি অর্গান ফেলিওর হবার মতো ঘটনাও ঘটে। এর কারণে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

আজকাল গলব্লাডারে স্টোন হওয়াটা খুবই কমন, বেড়ে যাচ্ছে। কারণ ওবেসিটি বাড়ছে, কোলেস্টেরলের অসুখ বাড়ছে, ডায়াবেটিস বাড়ছে, তার সাথে গলব্লাডারে স্টোনও বাড়ছে। একশোজন গলব্লাডার স্টোনের রোগীর মধ্যে দশ জনের স্টোনের টুকরো গলব্লাডার থেকে খসে এসে পিত্তনালী বা বাইল ডাক্টে আটকে যায় ।

ডায়াগনোসিস

লিভার ফাংশন টেস্ট করা হয়, সংক্রমণ হয়েছে কি না জানার জন্য ডব্লিউ.বি.সি কাউন্ট এবং রুটিন ব্লাড চেক করে নিতে হয়।

আলট্রা সোনোগ্রাফি সাধারণত বাইল ডাক্ট অবস্ট্রাকশন বলে দিতে পারে।

আরো ভালো করে কারণ জানতে গেলে অর্থাৎ আগে যে পাঁচটা কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, সেটা জানতে সিটি স্ক্যান অ্যাবডোমেন বা এম.আর.সি.পি করতে হয়। এম.আর.সি.পি করলে বাইল ডাক্ট পিত্তনালীর জায়গাটার অ্যানাটমি বা স্ট্রাকচারটা দেখিয়ে দেবে। এম.আর.সি.পি সব থেকে ভালো করে দেখাবে, সিটি স্ক্যান বা ইউ.এস.জি-র থেকেও ভালো করে দেখাবে।

ইউ.এস.জি করলে জানা যাবে অবস্ট্রাকশন হচ্ছে কি না। এম.আর.সি.পি এবং সিটি স্ক্যান কী কারণে অবস্ট্রাকশন হচ্ছে সেটা দেখিয়ে দেবে। ডায়াগনোসিস বলতে এটুকুই। অর্থাৎ ডব্লিউ.বি.সি কাউন্ট, ইউ.এস.জি, লিভার ফাংশন টেস্ট, রুটিন ব্লাড টেস্ট, সিটি স্ক্যান অ্যাবডোমেন এবং এম.আর.সি.পি।

চিকিৎসা

বাইল ডাক্ট অবস্ট্রাকশনে বলাই আছে যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই অবস্ট্রাকশনকে মুক্ত করতে হবে। রোগীর অবস্ট্রাকশন কেটে গেলে ক্লিনিক্যাল ইমপ্রুভমেন্ট হবে।

অবস্ট্রাকশন মুক্ত করার উপায় হল ই.আর.সি.পি। ই.আর.সি.পি মানে এক ধরনের এন্ডোস্কোপির মতো। এন্ডোস্কোপটাকে মুখের মধ্যে দিয়ে ডিওডেনামে যাওয়া হবে যেখানে পিত্তনালীটা খুলছে খাদ্যনালীতে।

সেখানে এন্ডোস্কোপের অগ্রভাগটা রেখে এন্ডোস্কোপের মাথা থেকে কোনো পাইপ বা তার বা ক্যাথিটার ঢুকিয়ে পিত্তনালীর মধ্যে দিয়ে স্টেন্ট ঢুকিয়ে দেওয়া হবে, যাতে পিত্তটা ড্রেনেজ হয়ে যায়। (পিত্তনালীর মুখটা চিরে দেওয়া হবে তার মধ্যে স্টেন্ট বা ফাঁপা প্লাস্টিকের পাইপটা ঢুকিয়ে ড্রেনেজ করে অবস্ট্রাকশনকে রিলিজ করা হয়।)

এছাড়া অবস্ট্রাকশনের কারণ যদি স্টোন হয়, স্টোনটাকে তাহলে বার করে দেওয়া হবে বেলুন দিয়ে।

যদি টিউমার হয় টিউমার থেকে বায়োপসি নেওয়া হবে।

এভাবে সঠিক চিকিৎসাটা করা যেতে পারে।

যদি কৃমির কারণে অবস্ট্রাকশন হয় তাহলে তাকে টেনে বার করে দিতে হবে। যদি টিউমার বা ক্যানসারের কারণে হয় তাহলে স্টেন্ট পরিয়ে রাখা যায় এবং পরবর্তী ক্যানসারের যা যা চিকিৎসা আছে সেগুলো করা হবে।

এটার পরে ই.আর.সি.পি করলে রোগীর জনডিস কমবে। রোগীর ক্লিনিক্যাল কনডিশন ভালো হবে। অবস্ট্রাকশনটাও যাবে।

অবস্ট্রাকশনের কারণ হিসেবে যা ধরা পড়বে যেমন টিউমার, ক্যানসার সেক্ষেত্রে জনডিস কমার পর যদি সার্জারির দরকার লাগে সার্জারি করতে হবে। যদি অন্য কোনো থেরাপি লাগে সেই থেরাপি করতে হবে। যেক্ষেত্রে মনে হবে এমন একটা ক্যানসার বা ম্যালিগন্যান্সি যেটা শরীরের অনেক দূর অবধি ছড়িয়ে গেছে আর কিছু করার নেই, যেটা সিটিস্ক্যান, এম.আর.সি.পি-তে ধারণা করা যায় সেক্ষেত্রে প্লাস্টিক স্টেন্ট না করে মেটাল স্টেন্ট করা হয়। মেটাল স্টেন্ট দীর্ঘস্থায়ী হয়। ক্যানসারের রোগী যখন অবস্ট্রাকটিভ জনডিস নিয়ে আসে তখন মেটাল স্টেন্ট দেওয়া হয় তাতে অন্তত যে কটা দিন বাঁচবেন ততদিন একটা স্থায়ী ব্যবস্থা হয়। ❑

ঘুমের অভাবে নানা রোগ

ডাঃ কুন্তল মাইতি
(বিশিষ্ট ই.এন.টি বিশেষজ্ঞ)
মোবাইল : ৯৮৩০০৪৫৫৭০

ঘুম বা নিদ্রা মানে শরীরের বিশ্রাম। ঘুম যত গাঢ় হয়, মন তত প্রফুল্ল থাকে। কিন্তু ঘুম গাঢ় না হলে মন ভালো থাকে না। সারাদিন শরীরে ক্লান্তির ভাব থাকে, থেকে থেকে ঝিমুনি আসে। আসলে ঘুম শুধু শরীর নয়, শরীরের পাশাপাশি মনের, মস্তিস্কের বিশ্রামের সময়। তবে ঘুমের মধ্যেও শরীরের কাজকর্ম চলতেই থাকে। ব্রেন, শরীরের কোষ কিংবা শরীরের বিভিন্ন অর্গান কখনোই ঘুমের সময় ঘুমোয় না, তাদের কাজকর্ম থাকে। শুধু অ্যাক্টিভিটিটা কমে যায়।

ঘুমের দরকার কেন

সারাদিন ধরে শরীর যে সমস্ত কাজ করে তার ফলে শরীরের ভেতরে যে সিস্টেমগুলো চলে তার ওপর একটা প্রেসার থাকে। ঘুম এসে শরীরের এই প্রেসারগুলোকে রিলিফ দেয়। না চাইলেও শরীর জানান দেয় সে ক্লান্ত হয়ে গেছে, এবার তার বিশ্রাম দরকার। শরীরকে চার্জ করে ঘুম। স্বাভাবিক ঘুম সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পাতলা হয়ে আসে এবং সূর্য ডোবার পর চোখ জুড়িয়ে আসার কথা। কিন্তু শহুরে জীবন মাঝরাতেও সচল থাকে।

জীবনে ব্যস্ততা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনশৈলীতে এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে। প্রাত্যহিক জীবনের রোজনামচা, দৈনন্দিন ঘড়ির কাঁটা অনেকাংশে বিগড়ে গেছে। এর প্রভাব পড়েছে ঘুমেও।

চিকিৎসকদের তথ্য অনুযায়ী শিশুদের দিনে নয় থেকে এগারো ঘণ্টা ঘুমোনো উচিত। কিশোর-কিশোরীদের, যাদের বয়স চোদ্দ থেকে সতেরো বছর তাদের আট থেকে দশ ঘণ্টা এবং প্রাপ্তবয়স্কদের দিনে সাত থেকে ন'ঘণ্টা ঘুম প্রয়োজন। একটানা কম্পিউটারের সামনে বসে কাজ অথবা সারাক্ষণ মোবাইল ব্যবহার কিংবা রাত জেগে মোবাইলে চ্যাট ইত্যাদির ফলে জীবনযাত্রায় কুপ্রভাব পড়ছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বায়োলজিক্যাল ক্লক।

ফোন ও ল্যাপটপ থেকে নির্গত ব্লু লাইটও বায়োলজিক্যাল ক্লকের ক্ষতি করে। এর ফলে ঘুমের সময় অনিয়মিত হয়ে অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। শরীরে থাইরয়েড কর্টিসোল হরমোন ঠিক সময়ে ঠিক পরিমাণে ক্ষরিত হচ্ছে না। এর ফলে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

বাড়ছে তাৎক্ষণিক ক্লান্তি, মনোযোগের অভাব, স্মৃতিশক্তির সমস্যা। অ্যাংজাইটি, বিরক্তি থেকে শুরু করে জটিল হৃদরোগ, নার্ভের সমস্যা, অবসাদ, অবসেসিভ কমপালসিভ ডিসঅর্ডারের মতো সমস্যাও বেড়ে চলেছে।

রাত জেগে কাজ করার ফলে ঘুমের সঠিক সময়ে আমরা ঘুমোচ্ছি না, ঘুম ভাঙছে সকাল দশটায়, যেটা সঠিক সময় নয়। এই সময় ব্রেকফাস্ট হয়ে যাবার কথা। ঘুম আর জাগা— যা একটা সাইকেলে চলে সেটা আমাদের লাইফ স্টাইলের কারণে সঠিকভাব হচ্ছে না। সকালে যে সব হরমোনের আধিক্য থাকে তখন আমাদের জেগে যাওয়ার কথা কিন্তু সে সময় আমরা গভীর ঘুমে, ফলে সেই হরমোনের কাজকর্মে গন্ডগোল হচ্ছে। এবার সকাল দশটায় উঠে ব্রেকফাস্ট করা কিংবা একেবারে বারোটায় খুব ভারী লাঞ্চ হয়ে যাচ্ছে, ফলে ওজন বাড়ছে, মেয়েদের পিরিয়ডের নানা রকম সমস্যা দেখা দিচ্ছে, মানসিক অ্যাংজাইটি বাড়ছে, ডিপ্রেশন হচ্ছে। মানুষ এখন খুব অল্প কথাতেই ইরিটেট হয়ে পড়ছে, বিরক্ত হয়ে ওঠে দু'-এক কথাতেই। এমনকী সেই বিরক্তি সব কিছুতেই দেখা যায়। বাসে-ট্রেনে ঝগড়াঝাঁটি, অফিসে গিয়ে কথা কাটাকাটি, পাড়ায় ঝামেলা, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝামেলা, টেনশন, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স ইত্যাদি সব কিছুর পিছনে কাজ করে ঘুম বা নিদ্রার প্রভাব। বেশির ভাগ মানুষ ঘুম নিয়ে সমস্যায় ভুগলেও ঘুম নিয়ে সচেতনতা অনেক কম।

অনেক ক্ষেত্রেই ঘুম না এলে ভাবেন সারাদিনের কাজের ধকল বা কাজের চাপ কিংবা রক্তচাপের সমস্যা।

ঘুমের সমস্যা নিয়মিত চলতে থাকলে মানসিক, শারীরিক উভয়রকম সমস্যাই তৈরি

হয়। ঘুমের মধ্যে শ্বাসকষ্টের সমস্যা হলে বা ঘুম না এলে তা থেকে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক পর্যন্ত হতে পারে। সাধারণত যারা ওবেসিটিতে আক্রান্ত তাদের ঘুম নিয়ে বেশি সমস্যা হয়। এর সঙ্গে বাচ্চাদের টনসিল, অ্যাডিনয়েডের সমস্যা থেকেও ঘুমের ঘাটতি হতে পারে।

অবশ্য এখন শুধু বাচ্চারা নয়, বড়রাও ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন সাইনাস, অ্যাডিনয়েডের সমস্যা নিয়ে। সাইনাসে পলিপ, টনসিল, অ্যাডিনয়েড বড় হলে ঘুমের সমস্যা দেখা দেয়। তারা যথেষ্ট পরিশ্রম করেন, ঘুমোতে চাইছেন কিন্তু ঘুমোতে পারছেন না। তারা যখন ঘুমিয়ে পড়ছেন তখন নাক এবং গলা দিয়ে যে হাওয়াটা লাংসে ঢোকে সেটাতে অবস্ট্রাকশন হচ্ছে। এটাকে ডাক্তারি পরিভাষায় অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া বলে।

এর ফলে বাচ্চাও নাক ডাকে যার কিনা নাক ডাকার কথা নয়, মুখ হাঁ করে নিশ্বাস নিচ্ছে, দাঁতগুলো সামনের দিকে বেরিয়ে আসছে, গলাটা ফুলে উঠছে, শরীরে ওজন বাড়ছে, খেলাধুলা করতে গেলে হাঁপিয়ে যাচ্ছে, বড়রা প্রচন্ড নাক ডাকছে। তবে নাক ডাকা মানেই কিন্তু অসুখ নয়। সমস্ত মিডিয়াতে নাক ডাকা নিয়ে এত বেশি মাত্রায় প্রচার করা হচ্ছে ফলে মানুষের মধ্যে একটা ভয়ও ঢুকে গেছে। এই ভয়টা কিন্তু সবসময় সঠিক নয়।

চল্লিশ বছর বয়সের পর যারা এক্সারসাইজ কম করেন, শরীর একটু ঢিলেঢালা, ভুঁড়ি বা ওজন বেশি তাদের মধ্যে নাক ডাকার প্রবণতা আসতে পারে। এরকম মানুষ আমরা আশেপাশে অনেক দেখি যারা কিনা সুস্থভাবেই জীবনযাপন করেন। তাই নাক ডাকা মানেই অসুখ নয়। কিন্তু ঘুম আসার পথে স্লিপ অ্যাপনিয়া বাধা হয়ে দাঁড়ালে যা ঘুমের সময়কে বিঘ্নিত করে, অক্সিজেন শরীরে কমে যাওয়ার কারণে কেউ এক ঘণ্টা বাদে বাদে, কেউ বা দশ মিনিট অন্তর ধড়ফড় করে উঠে বসে আবার পাশ ফিরে শোয়। ব্রেক হয় ঘুমের।

স্লিপ অ্যাপনিয়া যাদের যত বেশি তাদের ঘুমের বিঘ্নতা তত বেশি। এর ফলে সারাদিন লেথার্জি, ঝিমুনিভাব, অলসতা, মাথার যন্ত্রণা, কাজকর্মে মন না থাকা, ইরিটেবল অবস্থা, ঘুম ঘুম ভাব যদি কারো দেখা যেতে শুরু করে তাহলে কোনো ই.এন.টি ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

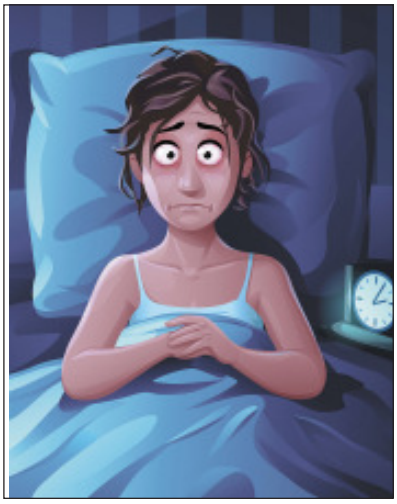

অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া যদি চলতে থাকে, ঘুমের বিঘ্নতা যদি খুব বেশি হয় তখন কিন্তু শরীরে নানা সমস্যা এসে হাজির হবে। যার প্রেসার ছিল না তার প্রেসার আসবে, যার সুগার ছিল না তার সুগার আসবে, হার্টের সমস্যা আসতে পারে, শ্বাসকষ্টের সমস্যা আসতে পারে।

এই সমস্যা আগে থেকে যে ছিল না এমনও নয়। তবে অনিয়মিত জীবন যাপন, অ্যালকোহল, হোটেল-রেস্তোরাঁয় খাওয়া-দাওয়া ফলে ওজন বাড়ছে আর এক্সারসাইজ কম হওয়ার কারণে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া বাড়ছে।

খাওয়া-দাওয়া, ঘুম এবং জীবনশৈলীতে একটু পরিবর্তন, অল্পবিস্তর হাঁটাহাঁটি, ওজন ঠিক রাখা, নিয়ম মতো জীবন যাপন ইত্যাদির মাধ্যমে অনেকাংশে সমস্যাটা কমানো যায় এবং ঘুমটাও ভালো হয়।

অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া যদি চলতে থাকে, ঘুমের বিঘ্নতা যদি খুব বেশি হয় তখন কিন্তু শরীরে নানা সমস্যা এসে হাজির হবে। যার প্রেসার ছিল না তার প্রেসার আসবে, যার সুগার ছিল না তার সুগার আসবে, হার্টের সমস্যা আসতে পারে, শ্বাসকষ্টের সমস্যা আসতে পারে। খাওয়া-দাওয়ায় হজমের গন্ডগোল হবে। আই.বি.এস-এর মতো লক্ষণ দেখা দেবে, হাত-পায়ের জোর কমতে থাকবে, ভিটামিনের সমস্যা হতে পারে, মেয়েদের পিরিয়ডের সমস্যা আসবে, পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম দেখা দিতে পারে।

কারো যদি সুগার, প্রেসার বা অন্য সমস্যাগুলো আগে থাকতেই থাকে, যে চিকিৎসায় সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছিল, যেমন কারো হয়তো অল্প হাঁটাচলা করলে সুগার, প্রেসার নিয়ন্ত্রণে থাকত বা একটা ওষুধে নিয়ন্ত্রণ থাকত, স্লিপ অ্যাপনিয়ার কারণে এখন তিনটে ওষুধেও হচ্ছে না। তাই ওষুধের মাত্রা বাড়ানোর আগে স্লিপ অ্যাপনিয়ার কারণে ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে কি না দেখতে হবে।

মারাত্মক ডিসফাংশন হয়ে ঘুমের মধ্যে রোগীর হার্টফেল পর্যন্ত হতে পারে। এটা হয় খুব কম লোকের কিন্তু হবার সম্ভাবনা থাকে।

ই.এন.টি-র ডাক্তার দেখিয়ে খাওয়া-দাওয়ার মডিফিকেশন, কিছু এক্সারসাইজ ও কিছু ওষুধে মেজরিটি রোগীর সমস্যা ঠিক হয়ে যায়। কিছু ক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখতে হয় কী ধরনের সমস্যা আছে। সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিলে বেশির ভাগ রোগী ভালো হয়ে যায়।

বিভিন্ন মিডিয়াতে ঘুম নিয়ে নানা অপপ্রচারও হয়। আর জ্ঞানের থেকে অপপ্রচার যখন বেশি হয় তখন মানুষ আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। স্লিপ অ্যাপনিয়া মানে বড় অপারেশন, বড় খরচ তা কিন্তু নয়। সাধারণত বেশির ভাগ রোগী ডাক্তারের পরামর্শ ও কিছু সাধারণ চিকিৎসায় ভালো হয়ে ওঠেন।

যে সব রোগী এগুলো মেনে চলতে পারেন না তাদের ক্ষেত্রে অপারেশনটাই অপশন হিসেবে থাকে। তবে অপারেশন হলেই কিন্তু সব শেষ নয়। অপারেশনের পরেও কিন্তু জীবনশৈলীর নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে। তা না হলে কিন্তু তেমন কোনো লাভ নেই।

অনিয়মিত ঘুম হলে শুধুমাত্র ঘুমের ওষুধ খাবেন না নিজের ইচ্ছেমতো। নিদ্রাহীনতার পেছনে অন্য কোনো কারণ থাকতে পারে। চিকিৎসককে দেখিয়ে নিশ্চিত হোন আগে। ❐

অনুলিখন ঃ শ্যামলী গঙ্গোপাধ্যায়

পায়খানার সাথে এই জীবাণু জলে মেশে ও জলের সাথে সাথে সংক্রামিত করতে পারে শাক –সব্জি জাতীয় খাদ্য এবং দুগ্ধ বা ডেয়ারি জাত খাদ্য বস্তু। সেই সংক্রামিত খাদ্যবস্তু রান্না বান্না ও খাদ্য গ্রহণের সময় যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি না মানলে সংক্রমন একের থেকে অন্যতে ছড়িয়ে পড়ে। বাড়ির সদস্য থেকে পাড়া, সেখান থেকে মহল্লা।

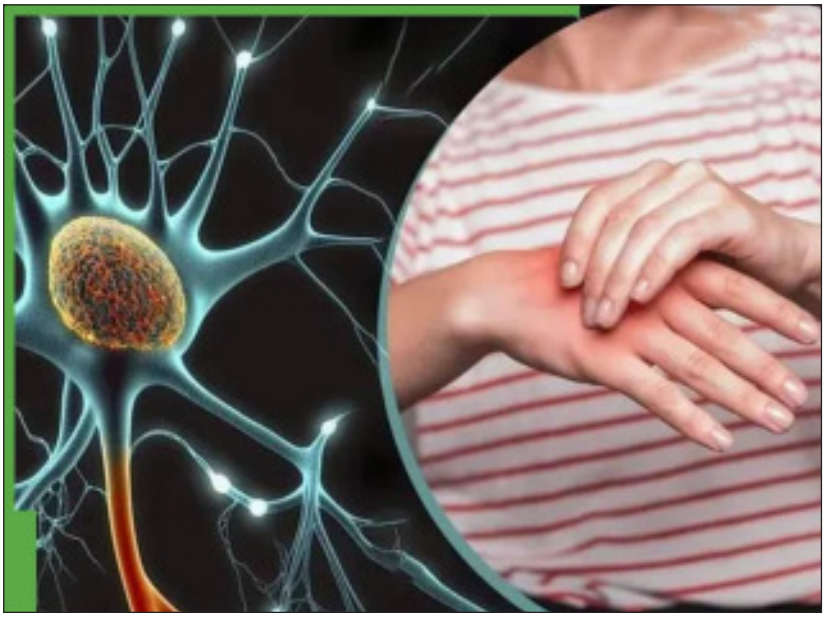

গুলেন বারি সিনড্রোম

আতঙ্ক নয়, সতর্ক থাকুন

ডাঃ সওকত আলী
মোবাইল : ৯৮৩০০৯৩২৬০

গুলেন বারি সিনড্রোম ডাঃ অশোক গুপ্তই প্রথম ধরতে পেরেছিলেন। মন্দিরে ভক্তদের ঢালা জল পুকুরে মিশেছে তাতেই দুষণ আর মহামারী। সেই গণশত্রু ডাক্তার রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। আজ্ঞে হ্যাঁ, সত্যজিতের কথা বলছি। ইবসেনের কাহিনীকে পর্দায় ফুটিয়েছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু আজকের এই জীবাণুর নাম বড় মধুর – ক্যাম্পাইলো ব্যাক্টার জেজুনাই। আমাদের পেটে থাকে, বাংলায় বললে বলা যেতে পারে সহভোজী বা সহভোগী। ইংরেজিতে কমেনসাল। সামান্য সংখ্যায় থাকে, ক্ষতি করে না। বাড়াবাড়ি হলে কলেরার মতো মহামারি । দাস্ত,বমি, পেট ব্যথা ইত্যাদি অর্থাৎ ডায়রিয়া। পায়খানার সাথে এই জীবাণু জলে মেশে ও জলের সাথে সাথে সংক্রামিত করতে পারে শাক –সব্জি জাতীয় খাদ্য এবং দুগ্ধ বা ডেয়ারি জাত খাদ্য বস্তু। সেই সংক্রামিত খাদ্যবস্তু রান্না বান্না ও খাদ্য গ্রহণের সময় যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি না মানলে সংক্রমন একের থেকে অন্যতে ছড়িয়ে পড়ে। বাড়ির সদস্য থেকে পাড়া, সেখান থেকে মহল্লা।

হাভেলি তহসিল এমনই একটি শহর, মহারাষ্ট্রের পুনে জেলায় অবস্থিত। সেখানে একটা কুঁয়ো আর পার্শ্ববর্তী জলবাঁধ বা ড্যামের সাথে (ব্যারেজ) ছিল যোগাযোগ। সেই জল কোনোভাবে দূষিত হল ক্যাম্পাইলোব্যাক্টার দিয়ে। ব্যাস, কেল্লা ফতে। হাজার হাজার লোক জল পান করল অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে । অসুখে ভুগল। মহামারির মতো এই রোগ ছড়াল মহারাষ্ট্রে। এসব আমার মতো আপনারাও দেখে থাকবেন বিভিন্ন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে।

খেলা এখানেই শেষ নয়। এই সব ভুক্ত ভোগী রোগীদের কয়েকদিন পর থেকে শুরু করে তিন সপ্তাহের মধ্যে দেখা দিল দ্বিতীয় উপসর্গ। হঠাৎ হাত, পা পড়ে যাওয়া বা প্যারালিসিস বা পক্ষাঘাত। দু'পা ছেড়ে ক্রমাগত উর্ধগতি, হাতে বুকে সর্বত্র। চলা ফেরা তো দূরঅস্ত, শ্বাস নেবার শক্তি থাকে না। ফলত চিকিৎসা না করালে মৃত্যু অনিবার্য।

জিজ্ঞাসার বিষয় এমন উদরাময় তো আকছার ঘটে থাকে। তা বলে তার পরিণামে সর্বাঙ্গে পক্ষাঘাত! কারণটা বোঝাতে সহজ করে আমাদের চলাফেরা, শ্বাস প্রশ্বাস, আমাদের পেশির নড়নচড়ন (সংকোচন প্রসারণ) নিয়ে দু' চার কথা বলি।

আমাদের দেহের পেশির সমস্ত ক্রিয়ার মূল চালিকা শক্তি হল নার্ভতন্ত্র। জালের মতো সারা অঙ্গপ্রতঙ্গে ছড়িয়ে আছে। যেমন বিজলির তার। মেন লাইন, সাব লাইন, হাইটেনশান লাইন।

সেরকম মানুষের স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্রে হল ব্রেন ও স্পাইনাল কর্ড যাদের বলে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র । এরা অস্থি বা হাড়ের ঘেরাটোপে নিরাপদে থাকে। এদের থেকে গোছা গোছা তারের মতো নার্ভ–তন্তু হাড়ের ফাঁক ফোকরের মধ্যে দিয়ে সুবিন্যস্ত ভাবে বের হয়। শাখায় শাখায়, ছোট ছোট গোছায় ভাগ হতে হতে গন্তব্যে পৌঁছয় একেবারে শেষ প্রান্তে। তাই ছড়িয়ে পড়া নার্ভদের বলা হয় প্রান্তস্থ স্নায়ু তন্ত্র বা পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম। এই স্নায়ু প্রধানত দড়ি বা রজ্জুর মতো ক্রমশ সরু হয়ে সুতোর মতো অঙ্গে ছড়িয়ে থাকে। নার্ভ কোষ বসে থাকে অনেক দূরে। লম্বা হাত তার বেরিয়ে যায় তন্তু হিসাবে দূরে আরো দূরে। এই তন্তুই বার্তা বহন করে নিয়ে যায় হেড অফিস (সিএনএস) থেকে মাংসপেশি ও অঙ্গে এবং সেটি বিদ্যুৎ প্রবাহের মাধ্যমে। তারের মতো এই তন্তুর নাম অ্যাক্সন। বিদ্যুৎবাহি এই অ্যাক্সন যদি বিদ্যুতের তারের মতো প্লাস্টিকের খোলস দিয়ে ইনসুলেটেড না করা হয় তবে বিদ্যুৎ লিক হয়ে বেরিয়ে যাবে গন্তব্যস্থানের আগেই। ফলে বাল্ব জ্বলবে না বা পেশি নড়বে না। বিধাতা এই আক্সনকে মুড়েছেন মাইলিন সিদ বা সিথ নামের মোড়কে। এ আচ্ছাদন তৈরি হয় তন্তুরই গায়ে লেপ্টে থাকা কোষ থেকে যার নাম সোয়ান কোষ। বিদ্যুতের তারের মোড়ক যেমন প্লাস্টিক (অপরিবাহি) তেমন অ্যাক্সনের মোড়ক চর্বিজাতীয় জটিল রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরি যাকে সহজ ভাবে আমরা ডাকি গ্যাংলিওসাইড। এটি মূলত চর্বি জাতীয় জটিল যৌগ। এর সাথে সায়ালিক অ্যাসিড এবং গ্লুকোজ জাতীয় যৌগও যুক্ত থাকে। এগুলি সম্পূর্ণভাবে রাসায়নিক জটিল যৌগ।

ভাবছেন বাবা, এত জটিল জটিল তথ্য আমরা জেনে করবটা কী! বোঝার দরকার কারণ এরপর আমি অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডির কথা বলব।

ইমিউনিটির ব্যাপার

রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাই হল ইমিউনিটি। এর দেখভাল আর সামলানোর জন্য দেহে আলাদা একটা দপ্তর রয়েছে। এই তন্ত্রের মূল কর্মী বা কর্মচারী হল লিম্ফোসাইট। প্রধানত দু'–রকমের। এরা দেহে জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে সদা সর্বদা তৈরি থাকে। একটি পন্থা হল মিসাইলের মতো অ্যান্টিবডি তৈরি রাখা। এই

মহারাষ্ট্রের উৎসের কারণ হল ক্যামপাইলোব্যাক্টার ডায়ারিয়া। মানুষের অবহেলা ও অজ্ঞানতার কারণে স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যগ্রহণ বিধান না মেনে রোগটিকে ছড়ানো হয়েছে মাত্রাতিরিক্ত ভাবে। পুণে থেকে নাগপুর। যারা এই রোগটিকে পেটে ধরে দ্বিতীয় জায়গায় পৌঁছে পেটের মলের সাথে ব্যাক্টিরিয়াটিকে রোগী হয়ে আরো কয়েক মাইল দূরে ছড়িয়ে দিলেন সেখানেই বাঁধ দিয়ে রুখে দেওয়া উচিত ছিল।

অ্যান্টিবডি তৈরি হয় ক্ষতিকারক জীবাণুর বিরুদ্ধে, তার দেহের কোনো রাসায়নিককে চিনে নিতে পারে লিম্ফোসাইট। দেহের এই রাসায়নিক কে অ্যান্টিজেন বলা হয়। সমগ্র জীবাণুটাই অ্যান্টিজেন হতে পারে, তবে সচরাচর এদের দেহে লেগে থাকা বা গঠনকারী উপাদানের বাসায়নিক যৌগই অ্যান্টিজেনের কাজটি করে। এই রাসায়নিক তাকে পরদেশী শত্রু বলে চিনিয়ে দেয়। আমার দোসর নয়, আত্মীয় নয় বলে দেহের কোষ চিনে নিতে পারে প্রথমবার আলাপের সাথে অর্থাৎ প্রথম যখন জীবাণু সংক্রমণ ঘটায়। এই নন সেলফ ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে কোষগুলি কিছুটা সময় নিয়ে (২–৪ সপ্তাহ) উৎপাদন করে খাপে খাপে মেলান নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি, যার আর এক নাম ইমিউনো গ্লোবিন। সারা শরীরে রক্তের মাধ্যমে ঘুরে বেড়ায় ও পাহারা দেয়। কোনো নন–সেলফ বা অ্যান্টিজেন পেলেই মিসাইলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ঘটে অ্যান্টিজেন–অ্যান্টিবডির কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। বলা বাহুল্য কমজোরী জীবাণুরা সব মারা পড়ে যদি আমার মিসাইল শক্তি ঠিক থাকে।

অটো অ্যান্টিবডি বা অটো ইমিউনিটি

দেহ আপনজন অর্থাৎ তার সর্ব অঙ্গের সর্ব উপাদানকে আপন বলে চিনতে শেখে ছোট্ট বেলায় জন্মানোর পর থেকে। মাঝে মাঝে নানান কারণে নিজের দেহেরই বাসায়নিক দেখে শত্রুর সাথে গুলিয়ে ফেলে। আপনজনকে ঘরের শত্রু ভেবে মিসাইল ছুঁড়ে দেয়। সেম সাইড গোল আর কি! আর ক্ষতিও করে । দেহের জয়েন্ট বা চামড়াতে থাকা কোলাজেন টিস্যু, থাইরয়েডের কোষের রাসায়নিক উপাদানকে অচেনা বলে ভুল করে বসে। নিজেই নিজের ক্ষতি করে ফেলে। একেই আমরা বলি অটো ইমিউন ডিসঅর্ডার।

ক্যাম্পাইলোব্যাক্টারের কোষ প্রাচীরের রাসায়নিক উপাদান আর নার্ভতন্তুতে থাকা গ্যাংলিওসাইডের দারুণ মিল। ফলে ক্যাম্পাইলোব্যাক্টার রুখতে আমাদের দেহে যে প্রতিরোধ (এবং অ্যান্টিবডি) তৈরি হয় তা ভুল করে গ্যাংলিওসাইডকে আক্রমণ করে বসে ও প্রদাহ বা ইনফ্লামেশান তৈরি করে। ফলত নার্ভ তন্তুর জামা বা ইনসুলেটার মাইলিন সিথ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নার্ভের বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। নার্ভের দ্বারাই পেশির সংকোচন –প্রসারণ, নার্ভের দ্বারাই অনুভুতি গ্রহণ ও প্রেরণ সব চলে । সব বন্ধ। পেশি হয়ে যায় অথর্ব। এই অবস্থাকে ডিমাইলিনেশান বলে। এরকম একটি অসুখের নাম হল জিবি সিনড্রোম। উচ্চারণে গুয়েন বারে (ফরাসী উচ্চারণ)।

জিবি সিনড্রোম

গুয়েন বারে বা গুলেনবারি সিনড্রোম। উদ্ভাবন ১৯১৬ সালে। গবেষণাপত্রে প্রকাশিত অসুখটিকে অটো ইমিউন রোগ বলা হয় এবং নাম ধরা হয় অ্যাকিউট ডিমাইলেনেটিং ডিসঅর্ডার। হঠাৎ এখন এই মুহূর্তে এই রোগ নিয়ে এত হৈ চৈ কেন ! হুজুগ! এই রোগ খুবই বিরল এক রোগ। নিজে নিজেই ঠিক হয়ে যায়। এক লক্ষ লোকের মধ্যে এক বা দুজনের এই রোগ হয়। গবেষণা বলছে। শতকরা নব্বইজন সুস্থ হয়ে ওঠেন। শতকরা দশ জনের বাড়তি জটিলতা হতে পারে। আর ১০০ জন রেগীর মধ্যে প্রাণঘাতী হতে পারে সর্বোচ্চ সাত পর্যন্ত। তাই হেলাফেলা করতে বলছি না।

এই হাটে বাজারে, বাসে–ট্রেনে হুজুগের হৈ চৈ–কে কেন্দ্রীভূত করতে চাইছি সতর্কীকরণের এক উপদেশ ও জানকারি দিয়ে। কথা হল এই

রোগ কি হঠাৎ এল! ১৯১৬ সাল থেকে হয়ে আসছে। এই তো কদিন আগে ডাক্তার ভাই সালামতের হাসপাতালে দেখে এলাম এক রোগী, শ্বাস-প্রশ্বাস বিকল, তাই ভেন্টিলেটারে। জরুরি চিকিৎসা চলছে। একশো ভাগ মনে হল সুস্থ হয়ে উঠছেন। এসব ক্ষেত্রে উদ্রেককারি রোগটি হয়তো ক্যামপাইলোব্যাক্টার নয়, অন্যান্য আরো নানান কারণে ছদ্মবেশী অ্যান্টিজেনের প্রভাবে এরকম অটো অ্যান্টিবডি তৈরি হতে পারে।

মহারাষ্ট্রের উৎসের কারণ হল ক্যামপাইলোব্যাক্টার ডায়ারিয়া। মানুষের অবহেলা ও অজ্ঞানতার কারণে স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যগ্রহণ বিধান না মেনে রোগটিকে ছড়ানো হয়েছে মাত্রাতিরিক্ত ভাবে। পুণে থেকে নাগপুর। যারা এই রোগটিকে পেটে ধরে দ্বিতীয় জায়গায় পৌঁছে পেটের মলের সাথে ব্যাক্টিরিয়াটিকে রোগী হয়ে আরো কয়েক মাইল দূরে ছড়িয়ে দিলেন সেখানেই বাঁধ দিয়ে রুখে দেওয়া উচিত ছিল।

ক্যাম্পাইলোব্যাক্টারের সাথে গঠনগত ভাবে গ্যাংলিওসাইডের মিল থাকায় আত্মঘাতী আঘাতে অ্যাক্সোনালড্যামেজ, প্যারালিসিস ফলে এক-দুজন প্রতি লক্ষ থেকে হঠাৎই রোগটি এক ভৌগলিক জায়গায় একশোর উপর পৌঁছে গেল। মৃত্যু ও আসন্ন মৃত্যু বেড়ে গেল দুর্ভাগ্যক্রমে।

উপসর্গ ও ধরণ

কীভাবে ও কেন হয় বিস্তারিত ও সহজ ভাবে ইতিমধ্যে বলার চেষ্টা করেছি। ক্যাম্পাইলোব্যাক্টার ছাড়াও উন্মেষকারী অটো অ্যান্টিবডি তৈরি করার ক্ষেত্রে আরো আসামিরা হল—

- বিশের কিছু ভ্যাকসিন।
- ভাইরাসঘটিত অসুখ (কোভিড, জিকা, সাইটোমেগালো ভাইরাস, এপসটাইনবার ভাইরাস)।
- পেটের নরো ভাইরাস।

নার্ভ তন্তু প্রধানত দু'-রকমের — সংবেদনশীল বা সেনসারি আর চেষ্টীয় বা মোটর নার্ভ। নার্ভে ঝিল্লি বা পর্দা (সিদ সিথ) থাকে আর কেন্দ্রে থাকে অ্যাক্সন। কোথাকার নার্ভ এবং নার্ভের কোন অংশে ক্ষতি হল তার উপর রোগীর উপসর্গ ও ধরন নির্ভর করে, যেমন—

- অ্যাকিউট ইনফ্লামেটরি ডিমাইলেনেটিং পলি নিউরোপ্যাথি, এ আই ডি পি।
- অ্যাকিউট মোটর অ্যাক্সোনাল নিউরোপ্যাথি, এ এম এ এন।
- অ্যাকিউট মোটর সেনসরি নিউরোপ্যাথি, এ.এম. এস. এ. এন।
- মিলার ফিশার সিনড্রোম।

শুধু চোখের প্যারালিসিস – ওপথ্যালমোপ্লেজিয়া।

- অটোনমিক নার্ভ ক্ষতিগ্রস্ত।

দেখা গেছে সত্তর শতাংশ এরকম রোগীর ক্ষেত্রে সূত্রপাতের এক থেকে তিন সপ্তাহের অতীতে কোনও না কোন কেচ্ছা ঘটে থাকে। সেটা ভাইরাল সর্দ্দিজ্বরের মতোই উপসর্গ হোক বা উদরাময়। কেননা এই সময়টা দেহ নেয় নিজের ইমিউনিটি (এখানে অটো ইমিউনিটি) তৈরি করতে। তারপর ধূম ধাড়াক্কা, ভাঙচুর, বোমাবাজির মতো ঘটনা—প্রদাহ বা ইনফ্লামেশন।

■ **উপসর্গ**

- এরকম একটা সাধারণ অসুস্থতা পশ্চাদপটে থাকার পরে হঠাৎ পায়ে পক্ষাঘাত যাকে বলে 'রাবারি লেগ'। শক্তি কম। দিনকে দিন বাড়ে এবং উপরের দিকে উঠতে থাকে, যাকে বলে অ্যাসেন্ডিং টাইপ। খুব দ্রুত ঘটতে থাকে।
- সাথে থাকে অবশ ভাব, ঝিন ঝিন, অন্যান্য নানান অনুভূতি যেমন জ্বালা, পিঁপড়ে চলা ইত্যাদি অনুভুতি।
- মুখ বেঁকে না গেলেও মুখের নড়াচড়া বন্ধ প্রায় শতকরা পঞ্চাশ জন রোগীর।
- মাথার নার্ভ বা ক্রেনিয়াল নার্ভও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে প্যারালিসিস। এর ফল খুব বিপজ্জনক যেমন কিছু গিলতে পারবে না এমনকী আপন থুথু, লালা সব গলায় জমে ঘড়ঘড়ে ভাব তৈরি করে, স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যাহত হয়।
- শ্বাস চালানর জন্য বুকের যে সব পেশি থাকে সেগুলি বিকল, অকেজো হয়ে যায়। ফলত শ্বাস-প্রশ্বাস দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে।

এই গোলমালের দুটি বিশেষত্ব, নীচের দিক থেকে উপর দিকে ধাওয়া করা। আর দেহের দু-পাশেই প্রায় সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।

- যন্ত্রণা-ব্যথা পায়ে হাতে হয় না বটে তবে ঘাড়ে, গলায় ও পিঠে খুব যন্ত্রণা হতে পারে। রোগীকে যখন হাসপাতালে পরীক্ষা করা হয়, তখন বিশেষ ভাবে দেখা হয়

– ডিপ টেন্ডন রিফ্লেক্স, যা প্রায় গরহাজির বা দুর্বল।

– সেন্সরি অনুভূতি তেমন প্রকট ভাবে পরিবর্তিত হয় না, গরম ঠান্ডা ও ব্যথার অনুভূতি ঠিকঠাক থাকলেও সন্ধিস্থলের টেন্ডন ও প্রোপায়োসেপসন (বিশেষ অনুভূতি), বিবশ ও বিকল হয়ে যায়।

রোগ নির্ণয়

বার্ড ফ্লু ভ্যাক্সিনেশানের সময় কিছু মানুষের হঠাৎ ফ্লাক্সিড প্যারালাইসিস জটিলতা দেখা যায়, এবং জিবি সিনড্রোম বলে ধারণা করা হয় তখন ব্রাইটন ওয়ার্কিং গ্রুপ একটি ক্রাইটেরিয়া ঠিক করে দেন জি বি সিনড্রোম ডায়াগনোসিস (নির্ধারণ) করার জন্যে। সে সব ডাক্তার বাবুদের ব্যাপার তাই বিস্তারিত উল্লেখ করলাম না। সেই উপসর্গ মাথায় রেখে ধাপে ধাপে চিকিৎসকরা ডায়াগনোসিস করেন।

বলা হয় অ্যাকিউট ফ্লাক্সিড প্যারালিসিস বা এ.এফ.পি – উপসর্গ অর্থাৎ হঠাৎ হাত পা সম্পূর্ণ আলগা হয়ে প্যারালিসিস হয়ে থাকলে মনে

সন্দেহ জাগাতে হবে। মিলিয়ে দেখতে হবে কাছাকাছি অতীতে কোনো ছোটখাটো সর্দ্দি জ্বর (ভাইরাল) বা ডায়রিয়া (ক্যাম্পাইলোব্যাক্টার) হয়েছে কি না।

দ্রুত উপরের দিকে উঠে যাওয়া। দেহের ডান বাম দু'–দিকে সমানভাবে আক্রান্ত হওয়া এবং সব শেষে এই রোগ বাড়তে বাড়তে একটা স্থিতিশীল অবস্থায় বা প্লাটু দশায় বা অধিত্যকায় পৌঁছয়।

✪ রোগ নির্ণয়ের প্রধান ও প্রথম পদ্ধতি হল রোগীর লক্ষ্মণ, উপসর্গ ও গতি প্রকৃতি অনুসরণ করা।

✪ দ্বিতীয় উপায় হল – মগজের বা সুষুম্নাকান্ডে থাকা রস যাকে বলে সেরিব্রো স্পাইনাল ফ্লুইড বা সি এস এফ পরীক্ষা। এতে প্রোটিনের পরিমাণ তুলনামূলক ভাবে কোষ বৃদ্ধির চেয়ে বেশি হয়ে যায়।

✪ তৃতীয় পরীক্ষাকে বলা হয় স্নায়ু সংবহন গতি বা প্রবাহ গতি নির্ণয় বা নার্ভ কন্ডাকশান ভেলোসিটি (এনভি সি)মাপা।

✪ আর অন্যান্য এই ধরনের কী কী রোগ হতে পারে তার সূক্ষ্ম বিচার–বিশ্লেষণ করে বাতিল ও নাকচ করা।

✪ ব্রাইটন ওয়ার্কিং গ্রুপ নির্ধারিত শর্ত মেনেছে কিনা তার বিচার।

তবে সমস্ত রোগী যে মুহূর্তে এই রোগের আওতায় আছে বলে মনে হবে সেই মুহূর্তে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করা জরুরি। সেখানে শ্বাস প্রশ্বাস সহায়তা দিতে পারে এমন ব্যবস্থা থাকা অত্যাবশ্যক।

চিকিৎসা চলাকালীন রোগীকে স্থিতাবস্থায় রাখতে নিত্য নৈমিত্তিক নানান ল্যাব পরীক্ষার দরকার হয়। সিটি স্ক্যান, এম আর আই ইত্যাদিরও দরকার পড়ে।

চিকিৎসা

সব সন্দেহ জনক রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করতেই হবে এবং রোগ নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ বা কনফার্ম করা হয়।

• হাসপাতালে আই সি ইউ বেডে ভর্তি।

• শ্বাস প্রশ্বাসের সংশোধন। দরকারে ভেন্টিলেশান সহায়তা থেকে পুরোপুরি ভেন্টিলেটার চিকিৎসা। ট্রাকিওষ্টমি করেও টিউব পরিয়ে দিয়ে শ্বাস প্রশ্বাসের ফিজিও থেরাপি তৎক্ষণাৎ শুরু করা উচিত।

• বিশেষ দামী দাওয়াই হল অ্যান্টিবডি বা

মাথার নার্ভ বা ক্রেনিয়াল নার্ভও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে প্যারালিসিস। এর ফল খুব বিপজ্জনক যেমন কিছু গিলতে পারবে না এমনকী আপন থুথু, লালা সব গলায় জমে ঘড়ঘড়ে ভাব তৈরি করে, স্বাভাবিক শ্বাস–প্রশ্বাস ব্যাহত হয়।

ইমিউনোগ্লোবিন, হিউমান ইমিউন (গ্লাবিউলিন) চিকিৎসা। উপযুক্ত পরিমাণে প্রথম পাঁচ দিনে প্রত্যহ ভাগ করে খুবই সতর্কতার সাথে দিতে হবে। এরা উদ্ভূত ক্ষতিকারক অ্যান্টিবডিকে ধ্বংস করে নার্ভকে রক্ষা করে।

• জটিলতার সম্মুখীন হওয়া – ভেন্টিলেটর লাগিয়ে দেহে অক্সিজেন সরবরাহ ঠিক রাখা।

• অটোনোমিক স্নায়ুতন্ত্র অসুস্থতায় পড়লে হার্টের ছন্দ ও গতির গোলমাল ঘটে। রক্তচাপেরও দারুণ বিকলতা ও গোলমাল দেখা দেয়। আই সি সি ইউ–এর মনিটরে চব্বিশ ঘন্টা একটা ডাক্তারবাবু নজর রাখেন এবং উপযুক্ত প্রতিকার মূলক ওষুধ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

• প্লাজমা ফেরেসিস বা অ্যাফেরেসিস যন্ত্রের সাহায্যে রক্ত দেহ থেকে বের করে তার জলীয় অংশ বা প্লাজমা সম্পূর্ণ পাল্টে দেওয়া হয় আলাদা ফ্লুইড বা স্যালাইন দিয়ে। এই প্লাজমা ফেলে দিলে তাতে থাকা মায়েলিন সিথের অ্যান্টিবডিও বিদূরিত হয়। এভাবে খেপে খেপে, ধীরে–সুস্থে পুরো প্লাজমা অ্যান্টিবডি মুক্ত করা হয়।

প্রতিরোধ

আপনা আপনি সামলে নিতে পারা এই অটোইমিউন অসুস্থতার জন্যে কোনো ভ্যাকসিন নেই। একটা দুটো কেস বছর ভর ঘটতেই থাকবে। আপনি আপনি ভালোও হয়ে যাবে বেশির ভাগ উপযুক্ত চিকিৎসাতে। তবে পুনে, বা মহারাষ্ট্রে যেমন হঠাৎ করে ব্যাপক ভাবে মহামারী হল তা কিন্তু মানুষের অবহেলা ও অজ্ঞতার জন্যে। আর এই না–জানা বিষয়টিকে তুলে ধরাই আমার এই লেখনীর প্রধান উদ্দেশ্য।

এই রোগ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেহে ডায়রিয়াজাত অসুস্থতার পরে ঘটে থাকে। যার কারণ ক্যাম্পাইলোব্যাক্টার নামের ব্যাক্টিরিয়া। এটি ছড়ায় জল ও ডেয়ারিজাত খাবারের সাথে। গাফিলতি—

• বিশুদ্ধ জল না ব্যবহার করা।

• পানীয় জল, রান্না ও খাবার দাবারে ব্যবহৃত জল রোগ জীবাণু যুক্ত হওয়া।

• ঠিক ভাবে ফুটিয়ে রান্না না করা, পাস্তুরাইজড দুধ ব্যবহার না করা।

• মলত্যাগের আগে ও পরে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকর বিধি না মেনে রোগযুক্ত মল পাশাপাশি জলাধারকে সক্রমণ করা।

• খাবার সময় উপযুক্তভাবে হাত ধুয়ে পরিষ্কার না করে খেতে বসা।

তাহলে পুণের মতো ঘটনা ঘটত না। এ ব্যাপারে পঞ্চায়েত বা কর্পোরেশানের বর্জ্য পদার্থ সরানোর কাজে জড়িত দপ্তরের কার্যকরী ভূমিকা থাকছেই।

সামান্য সর্দিজ্বরের পর বা সাম্প্রতিক কোনো ভ্যাক্সিনের পর সহসা হাত পা অবশ বা দুর্বল বোধ করলে তৎক্ষণাৎ হাসপাতাল বা চিকিৎসা।

শেষের কথা

আমাদের সংবাদ মাধ্যমে এখন রোজ জিবি সিনড্রোম শুনতে, দেখতে ও পড়তে থাকবেন। সাংবাদিকরা খুঁজে খুঁজে হাসপাতালে থাকা এই সব বিরল রোগীদের বের করবেন, বালিকুখাড়িতে একটি কেস, হারিটে নতুন কেস বলে ব্রেকিং নিউজ দিতে থাকবে। প্যানিক বা আতঙ্কগ্রস্ত হবেন না। এই রোগ ছোঁয়াচে নয় এতক্ষণ বুঝেছেন । তবে রোগ উদ্রেককারী ব্যাক্টিরিয়ার সংক্রমণ ছোঁয়াচে।

ফিরে আসুন পবিত্র সব গ্রন্থের উপদেশাবলীতে। পবিত্র পরিস্কার দূষণ মুক্ত খাদ্য রান্না করুন, পাক পবিত্র হয়ে খেতে বসুন। বর্জ্য পদার্থ যথার্থভাবে নিস্কাশন হচ্ছে কিনা দলবদ্ধভাবে চোখ রাখুন। পানীয় জল, দুধকে (পাস্তুরাইজড) পাক রাখার দিকে নজর দিন।

ব্যক্তিগত সংস্কারের সাথে সাথে সামাজিক সংস্কার ও পরিবেশ পরিস্কার রাখা এবং স্বাস্থ্য প্রযুক্তি ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের উপর নজর রাখা আম নাগরিকের কর্তব্য। ❑

টিউবারকুলোসিস এবং এইচ.আই.ভি হাত ধরাধরি করে চলে। সারা ভারতে ৪ মিলিয়নেরও বেশি এইচ.আই.ভি–তে আক্রান্ত। শুধুমাত্র ভারতবর্ষে টিউবারকুলোসিস এবং এইচ.আই.ভি এই দ্বৈত আক্রমণে ভুগছে অন্তত দশ লাখেরও বেশি লোক। সারা পৃথিবীতে ভারতেই এই দ্বৈত আক্রমণে আক্রান্তদের সংখ্যা সবচাইতে বেশি।

টিউবারকুলার এন্ডোমেট্রাইটিস থেকে সন্তানহীনতা

ডা. সবুজ সেনগুপ্ত
(স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ, মেডিকা সুপার স্পেশালিটি)
মোবাইল : ৯৪৩৪০০৯৭২৯

এই শিরোনাম দেখে অনেকেরই খুব খটকা লাগবে। টিউবারকুলোসিস তো সবারই জানা —তবে এই এন্ডোমেট্রাইটিসটা আবার কে?

এন্ডোমেট্রিয়াম হচ্ছে জরায়ুর ভেতরে একটা পাতলা আস্তরণ যেটা প্রত্যেক মাসে গর্ভধারণ–সক্ষম বয়সে ভেঙে ভেঙে পড়ে আর চলতি কথায় যাকে মাসিক বলে। প্রতি মাসে ভেঙে ভেঙে পড়ার সাথে আবার এটা গজিয়ে ওঠে।

এই এন্ডোমেট্রিয়ামেও হতে পারে টিউবারকুলোসিসের সংক্রমণ, যাকে জরায়ুর যক্ষ্মারোগ বলা হয়। তাতে কী হয়? হ্যাঁ, তাতে হতে পারে বন্ধ্যাত্ব ।

বিস্তৃত বলার আগে একটু ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করা যাক। টিউবারকুলোসিসের জীবাণু আদিকাল থেকেই মনুষ্যসমাজে ছিল। আনুমানিক ১৭ হাজার বছর আগে উমিং–এ বাইসনের দেহে এর চিহ্ন পাওয়া গেছে। গবেষকরা মিশরের মমির দেহেও (শিরদাঁড়ায়) টিউবারকুলোসিসের চিহ্ন পেয়েছেন (৩০০০—২০০০ খ্রিষ্টপূর্ব)। জেনেটিক স্টাডিতে দেখা গেছে ১০০ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকান দেহে এর চিহ্ন। ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশনের আগে গল্পগাথায় একে তুলনা করা হয়েছে রক্তচোষা বাদুড়ের (ভ্যাম্পায়ারের) সাথে। কারণ লক্ষ করা গিয়েছিল পরিবারে

একজন লোক মারা গেলে বাকি সবাই একে একে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। তাই তো তারা ভেবে নিয়েছিল প্রথম যে মারা গেছে সে বাকিদের আত্মা চুষে বের করে নিয়ে গেছে।

গ্রিকরা এর নাম দিয়েছিল 'থাইসিস'। হিপোক্রেটিস, গ্যালেনও এর কথা লিখে গেছেন। জরায়ুর যক্ষ্মা নিয়ে প্রথম লেখালেখি করেন মরগ্যাগনি (১৭৬১)। সাদারল্যান্ড বন্ধ্যাত্বের কারণ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে প্রথম টিউবারকুলোসিসের আক্রমণ দেখতে পান এন্ডোমেট্রিয়ামে। সেটা ছিল ১৯৪৩ সন।

পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে সংক্রামক অসুখ টিউবারকুলোসিস। প্রতি বছর সারা পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ এর সংক্রমণে ভোগে। সারা পৃথিবীর পরিসংখ্যান ধরলে ২০০০ মিলিয়ন সংক্রামিতদের মধ্যে প্রতি বছর ৯ মিলিয়ন যুক্ত হচ্ছে এবং তার মধ্যে ৩ মিলিয়ন মৃত্যুমুখে ঢলে পড়ছে। ভারতবর্ষে ৪০০ মিলিয়নের বেশি সংক্রামিত—১৫ মিলিয়ন তার মধ্যে অসুস্থ এবং ৩.৫ মিলিয়ন ছোঁয়াচে। প্রতি বছর ৩ মিলিয়ন এর মধ্যে যুক্ত হচ্ছে, ৫ লক্ষ মারা যাচ্ছে—প্রায় প্রতি মিনিটে একটি মৃত্যু এবং প্রতি দিন এক হাজারের বেশি রোগীর পরলোক প্রাপ্তি।

টিউবারকুলোসিস এবং এইচ.আই.ভি হাত ধরাধরি করে চলে। সারা ভারতে ৪ মিলিয়নেরও বেশি এইচ.আই.ভি-তে আক্রান্ত। শুধুমাত্র ভারতবর্ষে টিউবারকুলোসিস এবং এইচ.আই.ভি এই দ্বৈত আক্রমণে ভুগছে অন্তত দশ লাখেরও বেশি লোক। সারা পৃথিবীতে ভারতেই এই দ্বৈত আক্রমণে আক্রান্তদের সংখ্যা সবচাইতে বেশি।

গর্ভাবস্থায় টিউবারকুলোসিসের পরিসংখ্যান ভারতবর্ষে ঠিক জানা যায় না। এটুকু জানা গেছে যে গর্ভধারণ-সক্ষম মহিলাদের (১৭ থেকে ৩৫ বছর) মধ্যে এর আক্রমণ সবচাইতে বেশি। ১৯৬৯ সালে ডাঃ দেশমুখ নামের এক চিকিৎসক ২০০০ গর্ভবতী মহিলাকে পরীক্ষা করে তাদের মধ্যে ৫ শতাংশের বুকে সংক্রমণ পেয়েছেন এক্স-রেতে।

গর্ভাবস্থায় টিউবারকুলোসিসের লক্ষণ

প্রায় অর্ধেক থেকে দুই-তৃতীয়াংশের ক্ষেত্রে কোনো লক্ষণই দেখতে পাওয়া যায় না । কারণ যে যে লক্ষণগুলো একটু আধটু ফুটে ওঠে সেগুলো গর্ভাবস্থায় সবারই প্রায় হতে পারে।

জরায়ুতে যক্ষ্মার আক্রমণ হলেও সচরাচর আমরা টিউবারকুলোসিস বলতে যা বুঝি—যে ক্ষয়াটে চেহারা, ওজন কমে যাওয়া, সমানে কাশি—তা কিন্তু নাও হতে পারে। দিব্যি সুন্দরী হাসিমুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে—শুধু কষ্ট সন্তান না পাওয়াতে।

কাশি প্রায় দুই-তৃতীয়াংশেরই থাকে। বাকি লক্ষণগুলোর মধ্যে ওজন কমে যাওয়া, রাত্রিতে প্রচন্ড ঘাম, সন্ধেবেলায় জ্বর আসা আর ক্লান্তি, অপরিসীম ক্লান্তি—এগুলিই দেখতে পাওয়া যায়।

গর্ভাবস্থায় টিউবারকুলোসিসের কথায় পরে আসব। তার আগে বলা উচিত টিউবারকুলার এন্ডোমেট্রাইটিসের কথা, যাতে হতে পারে বন্ধ্যাত্ব।

কীভাবে নির্ণয় হবে জরায়ুতে যক্ষ্মার অস্তিত্ব ? হ্যাঁ, কঠিন। সুকঠিন সেই অস্তিত্ব নির্ণয়। কারণ জরায়ুতে যক্ষ্মার আক্রমণ হলেও সচরাচর আমরা টিউবারকুলোসিস বলতে যা বুঝি—যে ক্ষয়াটে চেহারা, ওজন কমে যাওয়া, সমানে কাশি—তা কিন্তু নাও হতে পারে। দিব্যি সুন্দরী হাসিমুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে—শুধু কষ্ট সন্তান না পাওয়াতে।

জরায়ুর এই এন্ডোমেট্রিয়াম একটা ছোট্ট অপারেশন করে বের করে নিয়ে (নাম এন্ডোমেট্রিয়াল বায়োপসি) তা একটা কাঁচে মাখিয়ে স্লাইড তৈরি করে (জিল-নিয়েলসান স্টেইন) মাইক্রোস্কোপে দেখলে টিবির জীবাণু দেখতে পাওয়া যেতে পারে। অথবা লোয়েনস্টেইন জেনসান মিডিয়ামে কালচার করেও এই জীবাণুর বৃদ্ধি দেখতে পাওয়া যাবে ৬ থেকে ৮ সপ্তাহ পরে। হিস্টোপ্যাথলজিস্টরা মাইক্রোস্কোপে দেখে টিউবারকুলার গ্রানুলোমা চিহ্নিত করেও নির্ণয় করেন এই রোগ।

সম্প্রতি পি.সি.আর বলে একটি পরীক্ষাও খুব সাড়া ফেলেছে এই অসুখ নির্ণয়ে। তাতে ভারতীয় বিজ্ঞানী ডাঃ প্রভাকরের অবদান অবিস্মরণীয়।

যেহেতু বন্ধ্যাত্বের কারণ হিসাবে জরায়ুর যক্ষ্মা আমাদের দেশে—যেখানে টিউবারকুলোসিসের পরিসংখ্যান এত বেশি—অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই এর নির্ণয় কষ্টসাধ্য হলেও অত্যন্ত জরুরি।

রোগ নির্ণয়ের পর আসছে চিকিৎসা। আইসোনায়াজাইড, রিফামফিসিন, ইথামবুটল এবং পাইরিজিনামাইড হচ্ছে এই অসুখের প্রাণদায়ী বিশল্যকরণী। অন্তত ছয় মাস থেকে নয় মাস চলবে চিকিৎসা, তাহলেই রোগমুক্তি।

এবার আবার চলে আসি গর্ভাবস্থায় টিউবারকুলোসিসের সংক্রমণ প্রসঙ্গে। আগেই বলা হয়েছে অতি প্রাচীন কাল থেকেই জানা ছিল এর অস্তিত্ব। হিপোক্রেটিস, গ্যালেন এবং আরও কিছু চিকিৎসক বলেছেন টিউবারকুলোসিস ভালো হয়ে যায় গর্ভসঞ্চার হলে। তাদের মতে

গর্ভ বাড়তে থাকলে ফুসফুসের ক্যাভিটি বা ক্ষতগুলো বুজে যায়। আর গর্ভাবস্থায় হরমোনের তারতম্যও রোগটাকে ভালোর দিকে নিয়ে যায়।

গ্রীসোল একদম উল্টোপুরাণ গাইতে শুরু করলেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে। তিনি বললেন যে, টিউবারকুলোসিস গর্ভাবস্থায় প্রচুর ক্ষতিসাধন করে। ড্রোলেট তো আরও দু ধাপ এগিয়ে বললেন—মৃত্যু সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায় যদি কোনো টিবি রোগীর গর্ভসঞ্চার হয়। এই যুক্তির এত রমরমা হল যে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে চিকিৎসকরা গর্ভপাতের পক্ষে জোরদার আন্দোলন চালালেন।

একদম আধুনিক যুক্তি হচ্ছে, সঠিক চিকিৎসা হলে টিউবারকুলোসিসের থেকে কোনোরকম ভীতিই আজ আর নেই। কারণ বিশল্যকরণীর মতো অত্যন্ত জীবনদায়ী ওষুধের উপস্থিতি।

এবারে আসা যাক গর্ভাবস্থা এই অসুখের ওপর কী প্রভাব ফেলে।

•এই অসুখ যদি অ্যাক্টিভ থাকে তো প্রজনন ক্ষমতা কমে যায়।

•জীবনদায়ী কেমোথেরাপি আবিষ্কৃত হবার আগে মা ও শিশু দুজনেরই ওপর প্রচন্ড কুপ্রভাব পড়ত। স্কাফার (১৯৭৫) বলেছেন যে, বিনা চিকিৎসায় থাকা রোগীদের মধ্যে মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ। জারকেডেলের মতে, টক্সিমিয়া, প্রসবোত্তর রক্তস্রাব এবং প্রসবে অসুবিধা সবই বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যায়। অসময়ে জন্মানো শিশুর পরিসংখ্যান ২৩ থেকে ৬৪ শতাংশ অবশ্যই চিকিৎসা না হলে (রাটনার)। অসময়ে প্রসব যন্ত্রণার কথাও বলেছেন কোহেন, জেনা প্রমুখরা।

তবে আধুনিক চিকিৎসায় সবাই একমত যে সুচিকিৎসা হলে মা ও শিশু দুজনেই ভালো থাকবে এবং পুরনো যুক্তিতে গর্ভপাত করিয়ে দেবার পরামর্শ আজ আর কেউ দেবেন না।

টিউবারকুলোসিসের চিকিৎসায় কোনো ফারাক থাকবে না সে গর্ভাবস্থা থাকুক আর না থাকুক।

ধাত্রী বিদ্যা বিশারদের কাছে কেন এটা এত জরুরি? কারণ ঠিক চিকিৎসা না হলে এটা ছড়িয়ে পড়তে পারে বাকিদের মধ্যে বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে।

এছাড়া গর্ভস্থ শিশুর ওপর টিউবারকুলোসিস এবং তার ওষুধের প্রভাব নিয়ে মাথাব্যথা থাকে। আর টিউবারকুলোসিস থাকলেই দেখতে হবে

আধুনিক চিকিৎসায় সবাই একমত যে সুচিকিৎসা হলে মা ও শিশু দুজনেই ভালো থাকবে এবং পুরনো যুক্তিতে গর্ভপাত করিয়ে দেবার পরামর্শ আজ আর কেউ দেবেন না। টিউবারকুলোসিসের চিকিৎসায় কোনো ফারাক থাকবে না সে গর্ভাবস্থা থাকুক আর না থাকুক।

আনুসঙ্গিক এইডস আছে কি না।

আগেই চারটি জীবনদায়ী কেমোথেরাপি ওষুধের কথা বলেছি। এর মধ্যে আই.এন.এইচ বা আইসোনায়াজাইড প্লাসেন্টা পেরিয়ে শিশুর কাছে পৌঁছয় কিন্তু তার ক্ষতি করে না। এটা সস্তা, যদিও লিভারের ওপর (হেপাটাইটিস)। রিফামফিসিন—কোনোরকম কুপ্রভাব মুক্ত, শিশুর ক্ষতি করে না। ইথামবুটল নিশ্চিন্তে গর্ভাবস্থায় ব্যবহার করা যায় যেহেতু কোনোরকম কুপ্রভাব নেই।

গর্ভাবস্থায় ধাত্রীবিদ্যা বিশারদ সর্বক্ষণ বক্ষরোগ চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ রেখে চলেন এবং সঠিক মাত্রায় ওষুধ ব্যবহারের দিকে সর্বদা খেয়াল রাখেন।

জন্মগত টিউবারকুলোসিস খুব কম দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু বোধহয় এই ডসের বাড়াবাড়িতে এবং প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়াতে এরও বেড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে।

যাই হোক আমাদের দেশে টিউবারকুলোসিসের সম্ভাবনা সবসময় মাথায় রাখতে হবে আর সচেতনতা সবার মধ্যে ছড়াতে হবে এই বলে যে সুচিকিৎসায় এর সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব। বন্ধ্যাত্বের কারণ হিসেবে টিউবারকুলোসিসের সম্ভাবনা প্রজনন বিজ্ঞানীরা কিন্তু সবসময় মনে রাখছেন।❑

সুস্বাস্থ্য প্রকাশিত
বইয়ের জন্য
যোগাযোগ করুন—
৯৮৩০০৬৭৩২৯
রেজিস্ট্রেশন
পোস্টে পাঠানো হবে।

রোগ–ব্যাধি নিয়েই মা হওয়া

ডাঃ উজ্জ্বল আচার্য
(স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ)
মোবাইল : ৯৪৩৪৩৬৭০০৩

অসুখ–বিসুখ তো গর্ভাবস্থা বোঝে না। তাই শরীর থাকলেই হাজির হবে অসুখ। আর গর্ভাবস্থায় সেটাই বড় সমস্যার। কেননা এ সময় থাকে ওষুধ নিয়ে হাজারো বিধিনিষেধ। স্বচিকিৎসা এখানে হয়ে উঠতে পারে আত্মহত্যার সামিল। তাই এসময় ছোটখাটো সমস্যাতেও একটা ওষুধের দানাও মুখে তোলা যায় না। উপায় শুধুমাত্র চিকিৎসকের পরামর্শ। আর কিছুই নয়।

ডায়াবেটিস

গর্ভাবস্থায় ১—১৪ ভাগ মহিলা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হতে পারেন।

গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস হতে পারে যাদের—

- বংশে ডায়াবেটিসের প্রকোপ থাকলে।
- আগের বাচ্চার জন্মকালীন ওজন ৪ কেজির বেশি হয়ে থাকলে।
- আগে মৃত বাচ্চা প্রসব হয়ে থাকলে।
- গর্ভবতী অতিরিক্ত মোটা হলে। গর্ভবতীর বয়স ৩০–এর বেশি হলে।

অসুবিধা কী কী হতে পারে

গর্ভপাত, সময়ের আগে প্রসব, সংক্রমণ, প্রি– এক্লাম্পসিয়া, পলিহাইড্রামনিয়োস, ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি, নেফ্রোপ্যাথি, প্রসবের সময় আঘাত, প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ ইত্যাদি। এছাড়া বাচ্চা আকারে বড় হওয়া, জন্মগত ত্রুটি, হার্টের রোগ, কিডনির রোগ, বাচ্চার ডায়াবেটিস ইত্যাদি।

■ চিকিৎসা :

ডায়েট কনট্রোল, ব্যায়াম, ইনসুলিন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়।

যদি ডায়াবেটিস কনট্রোলে থাকে এবং ইনসুলিন না লাগে তাহলে স্বাভাবিক প্রসবের জন্য অপেক্ষা করা যেতে পারে কিন্তু যদি ইনসুলিন দিয়ে চিকিৎসা করা হয় এবং বাচ্চার ওজন বেশি হয় তা হলে ৩৮ সপ্তাহে সিজার করা হতে পারে।

গর্ভাবস্থার প্রথম দিকে চিকেন পক্স হলে তা বাচ্চার চূড়ান্ত ক্ষতি করতে পারে। এই জীবাণু প্লাসেন্টার মধ্য দিয়ে শিশুকে আক্রমণ করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে বাচ্চার জন্মগত ত্রুটি বা বিকলাঙ্গতার সৃষ্টি করতে পারে। ক্ষতির সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি হয় গর্ভাবস্থার ১৩–২০ সপ্তাহে গর্ভবতী মা সংক্রামিত হলে।

এপিলেপ্সি বা মৃগীরোগ

কম ওজনের বাচ্চা, বিকলাঙ্গ বাচ্চা, মৃত বাচ্চা প্রসব হতে পারে রোগের চরিত্র অনুযায়ী অথবা মৃগীরোগের জন্য ব্যবহৃত ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায়। মায়ের মৃগী থাকলে বাচ্চার এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা চারগুণ বেড়ে যায়।

■ চিকিৎসা :

গর্ভাবস্থায় যত কম ওষুধ খাওয়া যায় ততই মঙ্গল। ফেনিটয়েন–এ সবচেয়ে বেশি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয়। ফেনোবার বিটোন, কারবামাজেপিন, ফেনিটয়েন গর্ভাবস্থায় ব্যবহার ‘করা হয়। ডায়াজিপাম খিঁচুনি কমাবার জন্য ব্যবহার করা হয়।

ফোলিক অ্যাসিডও দেওয়া হয়। ১৬–১৮ সপ্তাহে আলফা প্রোটিন এবং আলট্রাসাউন্ড করে দেখা হয় কোনোরকম বিকলাঙ্গতা আছে কি না। এবং সেক্ষেত্রে নিউরোলজিস্টের সঙ্গে পরামর্শ করে গর্ভপাত করানো হতে পারে।

প্রসবের পর বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানো যেতে পারে। জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য গর্ভনিরোধক বড়ি নিষিদ্ধ।

চিকেন পক্স

গর্ভাবস্থার প্রথম দিকে চিকেন পক্স হলে তা বাচ্চার চূড়ান্ত ক্ষতি করতে পারে। এই জীবাণু প্লাসেন্টার মধ্য দিয়ে শিশুকে আক্রমণ করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে বাচ্চার জন্মগত ত্রুটি বা বিকলাঙ্গতার সৃষ্টি করতে পারে। ক্ষতির সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি হয় গর্ভাবস্থার ১৩–২০ সপ্তাহে গর্ভবতী মা সংক্রামিত হলে। বাচ্চার যে সমস্ত ত্রুটিগুলো দেখা দিতে পারে সেগুলো হল হাত–পা ছোট হয়ে যাওয়া, বাঁকা হয়ে যাওয়া, ক্যাটারাক্ট, মস্তিষ্ক ছোট হওয়া, ব্রেন অ্যাট্রফি, কোরিওরেটিনাইটিস, হাইড্রোনেফ্রোসিস ইত্যাদি।

প্রসবের সময় বা তার কিছু আগে মা সংক্রামিত হলেও বাচ্চার সংক্রমিত হবার সম্ভাবনা থাকে। বাচ্চাকে এক্ষেত্রে ভ্যাকসিন দেওয়া যেতে পারে যদি প্রসবের ৫ দিন আগে বা পরে মা সংক্রামিত হন।

হাঁপানি

গর্ভাবস্থায় একটু–আধটু শ্বাসকষ্ট হয় প্রোজেস্টেরনের জন্য এবং রক্তে কার্বনডাই

অক্সাইডের চাপ কিছুটা কমার জন্য। গর্ভাবস্থায় হাঁপানি শতকরা ৩–৪ জন মহিলার ক্ষেত্রে দেখা যায়।

গর্ভাবস্থায় হাঁপানি থাকলে সময়ের আগে প্রসব হতে পারে। প্রি–এক্লাম্পসিয়া হতে পারে, বাচ্চার বৃদ্ধি ব্যাহত হতে পারে, বাচ্চার শ্বাসকষ্ট হতে পারে। মায়ের হঠাৎ করে শ্বাসকষ্ট হতে পারে যাকে বলে স্ট্যাটাস অ্যাসমাটিকাস। এছাড়া প্রাণঘাতী নিউমোথোরাক্স, করপালমোনেল, হার্ট ফেলিওর হতে পারে।

তীব্রতা অনুযায়ী বিটা–টু অ্যাগোনিস্ট ইনহেলার সলবিউটামল, স্টেরয়েড ইনহেলার বেকলো মিথাজোন, ইঞ্জেকশন স্টেরয়েড দেওয়া যায়। হাঁপানি মারাত্মক আকার নিলে অক্সিজেন, হাইড্রোকর্টিজোন ইঞ্জেকশন দিতে হতে পারে। প্রসবের পর বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানো যেতে পারে।

ম্যালেরিয়া

গর্ভাবস্থায় ম্যালেরিয়া হামেশাই দেখা যায় । গর্ভাবস্থায় ম্যালেরিয়া হলে মায়ের রক্তাল্পতা, রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কম হওয়া, জনডিস, কিডনি বিকল হয়ে যেতে পারে। হতে পারে খিঁচুনি এবং কখনও কখনও সেরিব্রাল ম্যালেরিয়ায় রোগী কোমায় চলে যেতে পারে। বাচ্চার ক্ষেত্রে গর্ভপাত, সময়ের আগে প্রসব, অপরিণত বাচ্চা, বাচ্চার বৃদ্ধি ব্যাহত হতে পারে। এমনকী মৃত্যু ঘটতে পারে পেটেই।

■ **চিকিৎসা :**

ক্লোরোকুইন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়, প্রাইমাকুইন ব্যবহার নিষিদ্ধ, রেজিস্ট্যান্ট হলে কুইনিন দিয়ে চিকিৎসা করা যেতে পারে। অ্যানিমিয়া হলে রক্ত দিতে হতে পারে। অ্যানিমিয়া প্রতিরোধের জন্য ফলিক অ্যাসিড খেতে হয়।

যক্ষ্মা বা টিবি

শতকরা ১–২ ভাগ মহিলা গর্ভাবস্থায় যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়।

গর্ভাবস্থায় যক্ষ্মা যাদের হতে পারে বা সন্দেহ করা যেতে পারে—

- বংশে কারোর যক্ষ্মা থাকলে।
- সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া হলে।
- বাসস্থানে বা আশেপাশে অনেক যক্ষ্মা রোগী থাকলে।এইডস আক্রান্ত হলে।

গর্ভাবস্থায় হাঁপানি থাকলে সময়ের আগে প্রসব হতে পারে। প্রি–এক্লাম্পসিয়া হতে পারে, বাচ্চার বৃদ্ধি ব্যাহত হতে পারে, বাচ্চার শ্বাসকষ্ট হতে পারে। মায়ের হঠাৎ করে শ্বাসকষ্ট হতে পারে যাকে বলে স্ট্যাটাস অ্যাসমাটিকাস। এছাড়া প্রাণঘাতী নিউমোথোরাক্স, করপালমোনেল, হার্ট ফেলিওর হতে পারে।

- মদ্যপানকারী হলে।
- শিরায় ইঞ্জেকশন নেন এমন মহিলা হলে।

<u>কীভাবে রোগ নির্ণয় সম্ভব</u>

কফ পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা হয়।

■ **চিকিৎসা :**

গর্ভাবস্থায় যক্ষ্মা বা টিবি হলে ভয়ের কোনো কারণ নেই যদি সময়মতো চিকিৎসকের পরামর্শ মতো সঠিক চিকিৎসা করা হয়। যক্ষ্মা এক্ষেত্রে কোনোরূপ মারাত্মক আকার ধারণ করে না কিংবা গর্ভাবস্থার ওপরও কোনো প্রভাব ফেলে না। কিন্তু চিকিৎসা ঠিকমতো না করা হলে সময়ের আগে বাচ্চা প্রসব হতে পারে, বাচ্চার বৃদ্ধি ব্যাহত হতে পারে কিংবা জন্মের পর বাচ্চার মৃত্যু ঘটতে পারে। গর্ভাবস্থায় যক্ষ্মার ওষুধ আইসোনিয়াজাইড, রিফামপিসিন, ইথামবিউটল, পাইরিজিনামাইড, ডট্স–এর মাধ্যমে দেওয়া হয়। এগুলো গর্ভাবস্থায় নিরাপদ। বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ানো নিরাপদ। জন্ম নিয়ন্ত্রণে গর্ভনিরোধক খাওয়া নিষিদ্ধ, লাইগেশন করানো যেতে পারে, যদি পরিবার সম্পূর্ণ হয়ে থাকে।

টক্সোপ্লাজমোসিস

গর্ভাবস্থায় কাঁচা মাংস কিংবা বিড়ালের মলের মাধ্যমে এই রোগে আক্রান্ত হতে পারেন কোনো মহিলা।

টক্সোপ্লাজমা সংক্রমণে গর্ভপাত, বাচ্চার বৃদ্ধি ব্যাহত হতে পারে, প্রসব হতে পারে মৃত সন্তানের।

গর্ভস্থ শিশুর হাইড্রোকেফালাস, কোরিওরেটিওনাইটিস, সেরিব্রাল ক্যালসিফিকেশন, মস্তিষ্কের গঠন ছোট হওয়া,বুদ্ধি হ্রাস হতে পারে।

রক্তের টর্চ পরীক্ষার মাধ্যমে এই রোগ নির্ণয় করা যায়। এই রোগ ধরা পড়লে ডাক্তারবাবুরা স্পাইরামাইসিন ওষুধ প্রেসক্রাইব করেন।

জনডিস

গর্ভাবস্থায় ইস্ট্রোজেন হরমোন বৃদ্ধির কারণে অনেক সময় পিত্তের সঞ্চালন ব্যাহত হয়ে রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা বেড়ে জনডিস হতে পারে, একে বলে ইন্ট্রা হেপাটিক কোলেস্ট্যাসিস।

সাধারণত গর্ভাবস্থার শেষ দিকে ধীরে ধীরে এই রোগ হতে দেখা যায়। দুর্বলতা, বমি ভাব বা বমি এবং সারা গা–হাত–পায়ে চুলকানি এই রোগের উপসর্গ। গর্ভাবস্থায় এই প্রকার জনডিসের কারণে সময়ের আগে প্রসব, কম ওজনের বাচ্চার জন্ম, গর্ভস্থ শিশুর মৃত্যু এবং প্রসব পরবর্তী রক্তক্ষরণ হতে পারে। অ্যান্টিহিস্টামিন, আর–সোডিঅক্সিকোলিক অ্যাসিড ইত্যাদি ওষুধে সুফল মেলে।

তবে গর্ভাবস্থায় জনডিসের অন্যতম কারণ হল ভাইরাল হেপাটাইটিস। হেপাটাইটিস–এ কিংবা বি ভাইরাসের সংক্রমণে মূলত হয়। সম্পূর্ণ বিশ্রাম, রোগীকে আলাদা রাখা, কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া, অনেক সময় ল্যাকটিউলোজ জাতীয় ওষুধের প্রয়োজন হয় এই প্রকার জনডিসে।

থাইরয়েড

গর্ভাবস্থায় থাইরয়েডের হাইপার কিংবা হাইপো দু'ধরনের গোলমালই হতে পারে।

গর্ভাবস্থায় হাইপার থাইরয়েডিজম হলে মায়ের হার্ট ফেলিওর হতে পারে। গর্ভপাত, বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া, মৃত বাচ্চার জন্ম এবং জন্মের পরে মৃত্যু ঘটতে পারে। ওষুধ চলাকালীন হঠাৎ তা বন্ধ করে দিলে বা অপারেশনের কারণে ঝুঁকি বাড়ে। অ্যান্টিথাইরয়েড ওষুধ কারবিমাজোল, মেথিমাজোল ব্যবহার করা হয়। ধীরে ধীরে ওষুধের মাত্রা কমানো হয়। এই ওষুধ বাচ্চার গয়টার সৃষ্টি করতে পারে। বাচ্চা প্রসবের পর বুকের দুধ খেতে অসুবিধা নেই। জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য গর্ভনিরোধক বড়ি খাওয়া চলবে না। গর্ভাবস্থায় হাইপোথাইরয়েডিজম হলে চিকিৎসা ঠিকমতো না করলে গর্ভপাত, মৃত বাচ্চা প্রসব, বাচ্চার বুদ্ধি কম হওয়া, অপরিণত বাচ্চার জন্ম হতে পারে। এক্ষেত্রে মায়ের প্রি-এক্লাম্পসিয়া হতে পারে, গর্ভবতী মহিলা ভুগতে পারেন রক্তাল্পতাতে। লিভো-থাইরক্সিন দিয়ে গর্ভাবস্থায় এই রোগের চিকিৎসা করা হয়।

হার্টের রোগ

গর্ভাবস্থায় হার্টের রোগ থাকলে মহিলার শ্বাসকষ্ট, হঠাৎ মূর্চ্ছা যাওয়া কিংবা বুকে ব্যথা হতে পারে। গর্ভাবস্থায় হার্টের রোগ থাকলে সময়ের আগে প্রসব, অপরিণত বাচ্চার জন্ম, কিংবা বাচ্চার বৃদ্ধি ব্যাহত হতে পারে, হতে পারে বাচ্চার হার্টের রোগ। সাধারণ রিউম্যাটিক হার্টের রোগ (মাইট্রাল স্টেনোসিস), এছাড়া জন্মগত হার্টের রোগ যেমন প্যাটেন্ট ডাকটাস আর্টারিওসাস, অ্যাট্রিয়াল বা ভেন্ট্রিকুলার সেপটাল ডিফেক্ট, কোয়ার্কটেশন, ফ্যালস্ টেট্রালজি জাতীয় হার্টের রোগ গর্ভবতী মহিলার হতে পারে। মারাত্মক হার্টের রোগ হলে যেমন প্রাইমারি পালমোনারি হার্টপারটেশন, গ্রেড ২ ও ৩ হার্টের রোগ হলে গর্ভপাত করিয়ে নেওয়া ভালো। হার্ট ফেলিওর হতে পারে গর্ভাবস্থায় যে সমস্ত ঝুঁকির কারণে, সেগুলো হল সংক্রমণ (মূত্রনালী, শ্বাসতন্ত্র বা দাঁতের), রক্তাল্পতা, অতিরিক্ত মেদ বৃদ্ধি, উচ্চরক্তচাপ, হাইপার থাইরয়েডিজম, নেশার দ্রব্য সেবন।

প্রসব সবসময় হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে করাই বাঞ্ছনীয়। সাধারণত নর্মাল ডেলিভারিই হয় এসব মহিলাদের। সিজারিয়ান সেকসনের প্রয়োজন হয় না, যদি না অন্য কোনো কারণে নর্মাল ডেলিভারি সম্ভব না হয়।

অ্যাপেন্ডিসাইটিস

গর্ভাবস্থায় প্রতি ২০০০ জনে ১ জনের এই রোগ হতে দেখা যায়।

গর্ভাবস্থায় অ্যাপেন্ডিসাইটিস নির্ণয় কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। কারণ বমিভাব এবং বমি গর্ভাবস্থার এবং অ্যাপেন্ডিসাইটিসের সাধারণ উপসর্গ। রক্তে শ্বেত কণিকার সংখ্যা বৃদ্ধি দুই ক্ষেত্রেই হয়। জরায়ুর আকার বাড়ার সঙ্গে অ্যাপেন্ডিক্স ওপরের দিকে এবং বাইরের দিকে সরে যায়, সেজন্য ব্যথা নির্দিষ্ট জায়গায় থাকে না। রোগ নির্ণয়ে অনেক সময় অন্য রোগ বলে ভুল হতে পারে, যেমন এক্টোপিক প্রেগনেন্সি, পায়েলোনেফ্রাইটিস, ওভারিয়ান সিস্ট, প্লাসেন্টার রক্তক্ষরণ অথবা ফাইব্রয়েডের ডিজেনারেশন। গর্ভাবস্থায় অ্যাপেন্ডিসাইটিস হলে গর্ভপাত, সময়ের আগে প্রসব, শিশু-মৃত্যু এবং গর্ভবতী মায়ের মৃত্যুও ঘটতে পারে।

এই ক্ষেত্রে রোগ ধরা পড়লে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অপারেশন করা দরকার।

গলব্লাডারে স্টোন বা পাথর

গর্ভাবস্থায় প্রতি ১০০০ জনের মধ্যে ১জনের এ রোগ হতে দেখা যায়।

যদি সেরকম উপসর্গ না থাকে তাহলে ওষুধের সাহায্যে চিকিৎসা করে গর্ভাবস্থা চালিয়ে যেতে বলা হয়। এবং ডেলিভারির পরে অপারেশন করা হয়। তবে কিছুদিন অন্তর অন্তর লিভার ফাংশন টেস্ট করা হয়। ব্যথা খুব হলে অ্যান্টিবায়োটিক এবং ব্যথার ওষুধ, স্যালাইন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। কিন্তু উপসর্গের পুনরাবৃত্তি ঘটলে ল্যাপারোস্কোপি করে গল ব্লাডারের অপারেশন করা হয়। মনে রাখতে হবে এই সময় অপারেশন খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। যদিও আজকাল অধিকাংশ সার্জেন অপারেশনই পছন্দ করেন।

ওভারিয়ান টিউমার

গর্ভাবস্থায় ওভারিয়ান টিউমার ২০০০ জনেরমধ্যে ১ জনের হতে দেখা যায়।

গর্ভাবস্থায় ওভারির টিউমারের কারণে প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যেতে পারে, বাচ্চার পজিশন পরিবর্তিত হতে পারে, বাচ্চার মাথা নীচে নাও নামতে পারে এবং প্রসব বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। গর্ভাবস্থায় ওভারির টিউমার ঘুরে যেতে পারে, সিস্টের মধ্যে রক্তক্ষরণ হতে পারে, টিউমার বা সিস্ট ফেটে যেতে পারে, গর্ভপাত বা প্রসবের পর সংক্রমণ হতে পারে। আলট্রাসোনোগ্রাফি করে এ রোগ নির্ণয় করাহয়।

■ চিকিৎসা :

এই চিকিৎসার মূল নীতি হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগ নির্ণয় করে অপারেশন করে টিউমার বাদ দেওয়া।

যদি সে রকম জটিলতা না থাকে তাহলে অপারেশনের সব থেকে ভালো সময় হল ১৪-১৮ সপ্তাহ। ৩৬ সপ্তাহের পরে রোগ নির্ণয় হলে প্রসব পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভালো এবং সেক্ষেত্রে প্রসবের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অপারেশন করা উচিত।

যদি জটিলতা থাকে তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অপারেশন করা দরকার। প্রসবের সময় যদি মনে হয় বাধার সৃষ্টি হচ্ছে প্রসবে, তবে সিজার করে বাচ্চা প্রসব করিয়ে টিউমারের অপারেশন করা হয়। প্রসবের পর রোগ নির্ণয় হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অপারেশন করা দরকার। ❑

শাণ দিন মগজাস্ত্রে

ডাঃ অঞ্জন ভট্টাচার্য
(শিশু বিকাশ বিশেষজ্ঞ,অ্যাপোলো মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল, ডিরেক্টর, নবজাতক শিশু বিকাশ কেন্দ্র)
মোবাইল : ৯৮৭৪৭৯৭৭২৬

'আচ্ছা ডাক্তারবাবু, ছেলেটির বুদ্ধি কি বাড়ানো যায় না?'

আজ থেকে মাত্র এক দশক আগেই যদি কেউ এই প্রশ্ন পৃথিবীর যে কোনো কোণা থেকে আমায় করতেন, আমাকে বলতে হত, যে ঈশ্বর আমাদের যে বুদ্ধি বা আই.কিউ দিয়ে জন্ম দিয়েছেন, তাই নিয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কেননা, তখনও মগজাস্ত্র আবিষ্কার হয়নি!

কিন্তু বিজ্ঞান তো থেমে থাকে না। একদিকে মানুষ যেমন অন্তরীক্ষযান সৌরবলয় অবধি পৌঁছে দিচ্ছে, তেমনই এই মানুষই আবার আবিষ্কার করে ফেলছে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরের পরিকাঠামো ও তাকে সমুন্নত করার পদ্ধতি।

মগজাস্ত্রের কথা জানতেই পারতাম না, যদি না বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) আমন্ত্রণ না জানাতেন শিশুবিজ্ঞানের প্রথম আই.সি.এফ কোর সেট (এ নিয়ে আগে বহুবার লিখেছি) নির্মাণে, কানাডার ভ্যাঙ্কুভার শহরে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাথে সেই পৃথিবীর প্রথম পাইওনিয়ারিং আই.সি.এফ কোর সেট-টি সেখানে নির্মাণ করার পরে, ওখানকার ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে, আমার অধীনে পৃথিবীর প্রথম কালচারাল ভ্যালিডেশন স্টাডি-টি সম্পন্ন করে ২০১৬ সালে সেটা প্রেজেন্ট করতে সুইডেনের স্টকহোমে গিয়ে প্রথম জানতে পারলাম মগজাস্ত্রের কথা। যে হলটিতে আমাদের স্টাডিটি প্রেজেন্ট করি, ঠিক তার পাশের হলেই দেখেছিলাম আমাদের সেশনটির ঠিক পরেই আছে এক্সিকিউটিভ ফাংশনিং বা ই.এফ নিয়ে পরবর্তী সেশনটি। আমাদের গ্লোবালি পাইওনিয়ারিং স্টাডিটি প্রেজেন্ট করেই তাই দৌড় লাগাই পাশের হলে, হাততালি থামবার আগেই (যেহেতু ইউরোপে তখনও সব কিছু সময় মেনেই চলত)।

ভাগ্যিস দৌড়েছিলাম, নইলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে হত পুরো সেশন। আমি পৌঁছনোর কিছুক্ষণ পর থেকেই যারা এলেন, প্রথমে তারা সিঁড়িতে বসলেন। তারও পরে যারা এলেন, তারা ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন দরজার কাছে। অ্যাতোটাই জনপ্রিয় ইএফ নিয়ে প্রোগ্রামটি, বিজ্ঞানীদের মধ্যে।

ইন্টেলিজেন্স বা বুদ্ধি যা যা নিয়ে মাপা হয়, তার মধ্যে অন্যতম ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হল ইএফ। সেই ইএফ-এর অভাব থাকে অনেক রোগে যার মধ্যে বোধহয় সব থেকে বিখ্যাত হল অটিজম। আর ২০১৫ সালের জুলাই মাসে, তখনও প্রকাশিত হয়নি ইমপ্যাক্ট স্টাডি, যেটা প্রথম বলে, অটিজমের সুচিকিৎসা সম্ভব (সেটা প্রকাশিত হয় ২০১৭-র জানুয়ারি মাসে)।

সুতরাং, তখনও সবাই খুব উৎসুক ইএফ সম্বন্ধে জানতে। যদি অটিজমের চিকিৎসাকে আর এক চিলতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়!

দেখা হয়ে গেল ভ্যাঙ্কুভারের শিশুবিকাশ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মরীন ও'ডনেল, জন ব্রাউন প্রমুখ সবার সাথে, যাদের শিশু বিকাশ কেন্দ্রে আমরা পৃথিবীর প্রথম শিশুকে আই.সি.এফ কোর সেট (হু) তৈরি করেছিলাম। তাঁরাও শিখতে এসেছেন, ইএফ-এর নতুন জ্ঞান কিছু এসেছে কি না জানতে! সেখানেই আমরা জানতে পারি মগজাস্ত্র সম্বন্ধে। ব্রেনের যে কানেকশনগুলোর যথাযথ ক্রিয়াকর্মের সুফল হল বুদ্ধিমত্তা, সেই যোগাযোগগুলোতে কোনোরকম সমস্যা এলে প্রয়োজন সেগুলোকে আবার সঠিক ফাংশনিং-এ ফিরিয়ে আনা।

সেই প্রচেষ্টাতেই ইউরোপ ও আমেরিকর কয়েকটি বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়, যেমন হাভার্ড, ক্যালটেক, ক্যারোনিন্সকা, ডিউক, ডাভিস ইত্যাদি নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার পরে অবশেষে আবিষ্কৃত হল পৃথিবীর সর্বপ্রথম টেকনিক, যাতে বুদ্ধিও বাড়ানো সম্ভব হল, অবশেষে!

মগজাস্ত্রের নাম হল COGMED প্রোগ্রাম। COGMED একটি AI(Artificial Intelligence) ভিত্তিক অন লাইন খেলা, যা ডিজাইন করা মানুষের নিজ নিজ বুদ্ধির বেস লাইন-এর ওপরে।

অর্থাৎ, আপনি যখন COGMED খেলতে শুরু করবেন, মগজাস্ত্রের সেন্ট্রাল সার্ভার বের করে ফেলবে আপনার আই.কিউ ৬০ না ১০৪!

পরের দিন খেলতে গেলে আপনি আবার পাবেন খেলা যেটা আই.কিউ ৬০-এর জন্য একরকম এবং ১০৪-এর জন্য তার মতো।

অর্থাৎ, COGMED একটি এমন প্রোগ্রাম, যার নিজের অভ্যন্তরীণ বুদ্ধিমত্তাই তাক লাগানো।

আজকে আপনি COGMED যে ভাবে খেললেন পরের দিন তার ভিত্তিতেই COGMED আপনাকে পরবর্তী চ্যালেঞ্জ ছুঁড়বে। কেননা, কার কতটা বুদ্ধি বাড়বে এক একদিনে, সেটা যেহেতু আলাদা আলাদা, কেননা উন্নতি নির্ভর করছে আপনার চেষ্টা, করার গতি ও মনোসংযোগের ওপর। COGMED তার ডায়ানামিক AI দিয়ে অ্যাডজাস্ট করতে থাকবে আপনার কোন প্রোগ্রাম প্রয়োজন পরের দিন। যাতে আপনার বুদ্ধি বা বুদ্ধ্যাঙ্ক (আই.কিউ) বাড়তে থাকে দিনে দিনে।

তাহলে, আপনি আপনার বা আপনার সন্তানের বুদ্ধি বাড়াতে চাইলে কী করবেন? আপনি যাবেন এমন কারোর কাছে, যিনি পারবেন আপনাকে দিয়ে এমনভাবে COGMED করাতে যাতে আপনার বুদ্ধ্যাঙ্ক যতটা বাড়া উচিত, বাড়ে।

আপনার বা আপনার সন্তানের মনো-সংযোগের অসুবিধা থাকলে, তিনি COGMED-এর সাথে সাথে আপনার বা আপনার সন্তানের মনোসংযোগের চিকিৎসাও করবেন, আবার লেখার গতি কম থাকলে চিকিৎসা দেবেন ডিসগ্রাফিয়ার। চেষ্টার অভাব থাকলে পাশাপাশি প্রোগ্রাম চালাবেন রেসিলিয়েন্স বাড়ানোর।

এই ধরনের ডাক্তারদের বলা হয় ডেভেলপমেন্টাল ডাক্তার। যারা আপনার বিকাশ নিয়ে কাজ করবেন। এবং আপনি যদি আপনার বুদ্ধি বাড়ানোর অনুরোধ নিয়ে এমন ডেভেলপমেন্টাল ডাক্তারের কাছে যান, যিনি COGMED ব্যবহার করতে জানেন, তিনি পারবেন বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে সত্যি সত্যিই আপনার বুদ্ধি চিরকালের জন্য বাড়িয়ে দিতে। আপনাকে সাবধান থাকতে হবে অবৈজ্ঞানিক ভাঁওতাবাজদের হাত থেকে।

স্টকহোমে COGMED-এর বৈজ্ঞানিক সমর্থন দেখে আমি প্রথম এর সুপ্রতুল ব্যবহারের রাস্তায় নামি।

অনেকেই আমাকে বলেন, আমার কাছে অনেক বড় বয়সেও যে সব কিশোর-কিশোরীরা

আপনি যখন COGMED খেলতে শুরু করবেন, মগজাস্ত্রের সেন্ট্রাল সার্ভার বের করে ফেলবে আপনার আই.কিউ ৬০ না ১০৪! পরের দিন খেলতে গেলে আপনি আবার পাবেন খেলা যেটা আই.কিউ ৬০-এর জন্য একরকম এবং ১০৪-এর জন্য তার মতো।

আসে, যারা কেউ অটিজমে ভোগে তো কেউ ADHD-তে, কারোর লার্নিং ডিসেবিলিটি আছে, আবার কারোর কম ইন্টেলিজেন্স। এটা কী করে সম্ভব যে এরা প্রত্যেকেই অবশেষে ক্লাসে প্রথম দশজনের মধ্যে আসতে পারে?

এদের মধ্যে কেউ কেউ আছে, যারা হয়তো জীবনের প্রথম দশ বছর কোনো কথাই বলতে পারত না, বা স্কুলের নাম শুনলেই পালিয়ে যেত, তাদের অধিকাংশই যখন অবশেষে কথা বলতে শুরু করল ঠিকঠাক ভাবে এবং স্কুলে ধীরে ধীরে রেজাল্ট ভালো করে উন্নতি করতে শুরু করল, তখনই লোকে জিজ্ঞেস করতে শুরু করল, ''কীভাবে'' কেননা, আগে বিজ্ঞান বলত, একটা বয়সের পরে এইসব রোগ ঠিক হয় না। আধুনিক বিজ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগে আজকাল যে সবই সম্ভব, সে তো আমরা বিগত ১৮ বছর ধরে প্রমাণ করেই চলেছি। COGMED তারই মধ্যে এমন একটি আয়ুধ, যার সুপ্রয়োগ, যথাযথ স্থানে আজ বহু হতাশ পরিবারকে নিয়ে এসেছে সাফল্যের পথে।

আজকে তাই গোখেল মেমোরিয়াল গার্লস কলেজের মতো কলেজ তাদের আন্ডার গ্রাজুয়েট বা পোস্ট গ্লাজুয়েট স্টুডেন্টদের কেরিয়ার কাউন্সেলিং করাচ্ছেন নবজাতক চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের (NCDC) সঙ্গে MoU করে।

কেননা, আমরা COGMED-এর মতো সব এমন মগজাস্ত্রের ব্যবহার করছি যে, যে ছাত্রীরা ফেল করার পথেধ এগোচ্ছিল, তারা দারুণ দারুণ রেজাল্ট করে ফেলছে। সম্প্রতি স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরাও আমাদের বৈজ্ঞানিক বায়োসাইকোসোশাল কেরিয়ার কাউন্সেলিং করে তার সুফল নিতে শুরু করেছেন।

শুনলে হয়তো মনে হবে ভয়ানক কিছু ব্যাপার। আসলে কিন্তু মগজাস্ত্রের ব্যবহার খুবই সহজ। আপনি যদি আপনার বা আপনার সন্তানের বুদ্ধি বাড়ানোর অনুরোধ নিয়ে আসেন, NCDC-তে আমরা প্রথম দেখে নেব যে আপনার বা আপনার সন্তানের মগজাস্ত্র ব্যবহার করার ক্ষমতা আছে কি না বা করে কোনো লাভ হবে কি না।

যদি সম্ভব হয়, তখন আমরা আপনাকে রেজিস্টার করাব COGMED ONLINE, কেননা COGMED দেশকালপাত্রের ওপর নির্ভরশীল না। মগজাস্ত্র একটি আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান।

আপনার দায়িত্ব হল টানা একমাস নিয়ম করে ১৫ মিনিট COGMED খেলাটা খেলবেন। রোজ টানা ২৫ দিন খেললে, ধাঁ করে বুদ্ধি বেড়ে বসে থাকবে। আর এরকদিন, দু'দিন না বসতে পারলে, বুদ্ধি তার থেকে এক ছটাক্ কম বাড়বে। সেই অনিয়ম বাড়াবাড়ি রকমের হলে, বুদ্ধি বাড়বে কম কম।

আমাদের দায়িত্ব হল, আপনি নিয়ম মানছেন কি না, সেই সম্বন্ধে আপনাকে অবগত করা। আর যেহেতু যা খরচা, তা মূলত ওই আন্তর্জাতিক অনলাইন রেজিস্ট্রেশনেই। তাই মগজাস্ত্র ব্যবহার করার ক্ষমতায় আপনার সন্তানকে একবার এনে দিতে পারলেই কেল্লা ফতে।

এই বৈজ্ঞানিক মগজাস্ত্র আপনার সন্তানকে রক্ষা করবে হীরক রাজাদের খপ্পরে পড়া থেকে। আর বুদ্ধ্যাঙ্কের সেই বৃদ্ধিই আপনার বা আপনার সন্তানের সব থেকে বড় রক্ষাকবচ।

সেই রক্ষাকবচ আমরা আপনাদের জন্য সুনিশ্চিত করতে পারব, আপনারা যদি আমাদের কাছে COGMED-এর রিপোর্ট জানার জন্য ফেরত আসেন। কেননা সেই ফেরত এসে কথা বলার জন্য আর আপনাকে আলাদা করে কিছু খরচ করতে হবে না।

তাই বুদ্ধি বাড়াতে চাইলে বিজ্ঞানের সুপ্রয়োগে মগজাস্ত্র COGMED-কে ব্যবহার করুন। ❑

‘ইতিবাচক’ মনোভাব কোনো ‘ব্রান্ডেড প্রোডাক্ট’ নয় যে অনলাইনে অর্ডার করে বা বড় শপিং মলে পাওয়া যাবে! ইতিবাচক হতে হলে নিজেকে তৈরি করতে হবে। মানসিক দৃঢ়তা, একাগ্রতা ও সাহসই মানুষকে ‘পজিটিভ’ করে তোলে

নিজেকে ইতিবাচক করে গড়ে তুলতে হয়

ডাঃ অমরনাথ মল্লিক
(মনোচিকিৎসক, কোঠারি হাসপাতাল ও উডল্যান্ড হাসপাতাল)
মোবাইল : ৯৯০৩৮৩৯৯৫৮

মানুষের মন যেমন বিচিত্র তেমনি তার গতি-প্রকৃতিও বিভিন্ন। কারো মন সরল, জলের মতো স্বচ্ছ, আবার কারো মনের জটিলতা, নীচতা অনেক হিংস্র জীবজন্তুর চেয়েও ভয়ঙ্কর। মানুষের আচার-ব্যবহার, ভাবনা-চিন্তায় তার মনের চাওয়া-পাওয়ার ছাপ পড়ে। মন বাইরের জড় ও জীবজগত থেকে বিভিন্ন অনুভূতি নিয়ে যেমন বিচার-বিশ্লেষণ করে তেমনি মনের অন্তর্জগতও তাকে অনুভূতির যোগান দেয়।

এই অনুভূতিগুলোর বিচার-বিশ্লেষণ সবার এক নয়। এখানেই একজনের সাথে অন্য জনের তফাত, কে কীভাবে বিশ্লেষণ করবে তা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। একটা গোলাপ ফুল দেখে কারো মনে প্রেমের কথা মনে হয়, আবার কারো মনে গোলাপের কাঁটার যন্ত্রণা মনে পড়ে। এর ফলে সৃষ্টি হয় আবেগ বা ইমোশন, যেমন রাগ, দুঃখ, আনন্দ, ভালোবাসা, হিংসা প্রভৃতি মনের বিভিন্ন আবেগ আমাদের আচার-ব্যবহারে প্রভাব ফেলে থাকে। শুধু তাই নয়, শারীরিক পরিবর্তনের জন্যও এই আবেগ দায়ী হয়ে থাকে। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলা যাক।

স্কুলের বাৎসরিক পরীক্ষার ফল ভালো হয়নি, রেজাল্ট দেখে মা ও বাবা দু'জনেই শুধু অসন্তুষ্ট নন, যথেষ্ট হতাশও হয়েছেন। ছেলেকে বকাবকি করলেন। সারাক্ষণ মোবাইল, টিভি দেখার জন্য ‘এই দশা’ বলে অনুযোগ করলেন। ছেলের মনে মা-বাবার প্রতি রাগ ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হল। তারা ভালোবাসে না, শুধুই লেখাপড়ার কথা বলে কষ্ট দেন বলে মনে হল। তার খিদে, ঘুম কমে গেল, মনটাও ভারাক্রান্ত হয়ে রইল। পরীক্ষার ফল খারাপ করার জন্য বাবা-মায়ের অনুযোগ নিয়ে ছেলের মনে যে সব চিন্তা এসে ভিড় করল, তা হল—

- মা-বাবা আমাকে ভালোবাসে না, শুধু বকে ও সমালোচনা করে।
- আমি লেখাপড়ায় খারাপ, আমার ভবিষ্যত অন্ধকার।
- আমি অপদার্থ। সবার থেকে খারাপ। আমাকে কেউ ভালোবাসে না।

ছেলের মনে এই ভাবনার জন্য রাগ, হতাশা, বিরক্তির সৃষ্টি হয়েছে, তার শরীরেও পরিবর্তন এসেছে, যেমন খিদে কমে গেছে, ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছে, মাথায় যন্ত্রণা ইত্যাদি। কোনো ঘটনা বা কোনো অবস্থাকে একজন কীভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করছে তার ওপরই তার আবেগ, আচার-ব্যবহার নির্ভর করে। কোনো ঘটনা ঘটলেই বা কোনো বিষয়কে যদি কেউ নেতিবাচক ভাবে বিচার করে বা তার ভাবনা নেতিবাচক হয় তাহলেই তার আবেগ, শারীরিক পরিবর্তন, ব্যবহারে পরাজয়মূলক চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন দেখা দেবে।

এখানে ছেলেটি ভাবছে তার বাবা-মা তাকে ভালোবাসে না। পড়াশোনা করতে বলা বা পরীক্ষার জন্য তৈরি হতে বলাকে কি সন্তানের প্রতি রাগ, বিদ্বেষ বলা যায়? বাবা-মা স্নেহ করেন, ভালোবাসেন বলেই তো সন্তানের মঙ্গল কামনা করে থাকেন। তার জন্যই লেখাপড়া করতে উৎসাহ দেন বা পরীক্ষায় খারাপ করার

জন্য বকাঝকা করেন। অসন্তুষ্ট হন। বাবা–মায়ের এই মনোভাবকে বুঝতে হবে। নেতিবাচক চিন্তা নয়, ইতিবাচক (পজিটিভ) ভাবনা–চিন্তা দিয়ে বুঝতে হবে।

এখন দেখা যাক নেতিবাচক (নেগেটিভ) ভাবনা কেন হয়?

অধিকাংশ জনই কোনো ঘটনা বা বস্তুকে ভুল বিশ্লেষণ করে ফেলে। তার জন্য তাদের আচার–ব্যবহারেও পরিবর্তন দেখা যায়। তারা খুব সহজেই রেগে যায়, মাত্রাতিরিক্ত চাপের মধ্যে থাকার জন্য কাজকর্মে ভুল হয়,অনেক ব্যাপারে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। অবশ্য ছোটবয়স থেকেই একজন যে পরিবেশে, পরিবারে বড় হয়েছে সেখান থেকেই তার মস্তিষ্কে ভাবনাচিন্তা, বিচার–বিশ্লেষণ করার অভিজ্ঞতার ছাপ পড়ে। প্রত্যেকের নিজস্ব 'বিলিভ সিস্টেম' তৈরি হয়। এছাড়া একজনের ছোট বয়স থেকে বেড়ে ওঠা 'ব্যক্তিত্ব' বা 'পার্সোনালিটি' তার আবেগ, ভাবনা–চিন্তাকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। মস্তিষ্কের বিভিন্ন নিউরোট্রান্সমিটারের ক্ষরণের তারতম্য, একজনের 'জেনেটিক মেক আপ' প্রভৃতির উপরেও নেগেটিভ ভাবনা–চিন্তা নির্ভরশীল। মানুষের মস্তিষ্কের আবেগ, অনুভূতির কেন্দ্র হল 'এমিগডালা'। এই এমিগডালা গুরুমস্তিষ্কের প্রি–ফ্রন্টাল লোবকে নিয়ন্ত্রণ করে' একজনের আচার–আচরণ, ভাবনা–চিন্তাকে পরিচালিত করে থাকে। এই এমিগডালা যদি প্রি–ফ্রন্টাল লোবকে 'হাইজ্যাক' করে তবে অস্বাভাবিক ভাবনা–চিন্তা, আবেগজনিত অসুবিধা দেখা যায়। রাগ, দুঃখ, হতাশা মাত্রাতিরিক্তভাবে প্রকাশ পায়।

অতিরিক্ত রাগ, বিদ্বেষ, হতাশা মানুষের ইতিবাচক (পজিটিভ) গুণাগুণকে অনেকখানি প্রভাবিত করে। মানুষের প্রেরণা, ভালোবাসা, বড় হবার ইচ্ছা প্রভৃতি মনের ইতিবাচক দিকগুলো ধ্বংসাত্মক চিন্তাভাবনা দিয়ে নষ্ট হয়ে যায়।

একটি পরিবারের শুধু আর্থিক দিক নয়, ন্যায়–নীতিবোধ, সংস্কৃতি সেই পরিবারে বেড়ে ওঠা ছেলেমেয়েদের মানসিকতায় অনেকখানি প্রভাব ফেলে থাকে। নিম্নবিত্ত ও অতি দরিদ্র পরিবারে অনেক সময় মূল্যবোধ, ন্যায়নীতি বোধ অন্যদের বিস্মিত করে থাকে। ইতিবাচক মনোভাবের মধ্যে শুধু অর্থ নয়, সুস্থ সামাজিক চিন্তাভাবনা ও মূল্যবোধ খুবই প্রয়োজনীয় উপাদান। প্রচুর বিত্তবান পরিবারের সদস্যদের,

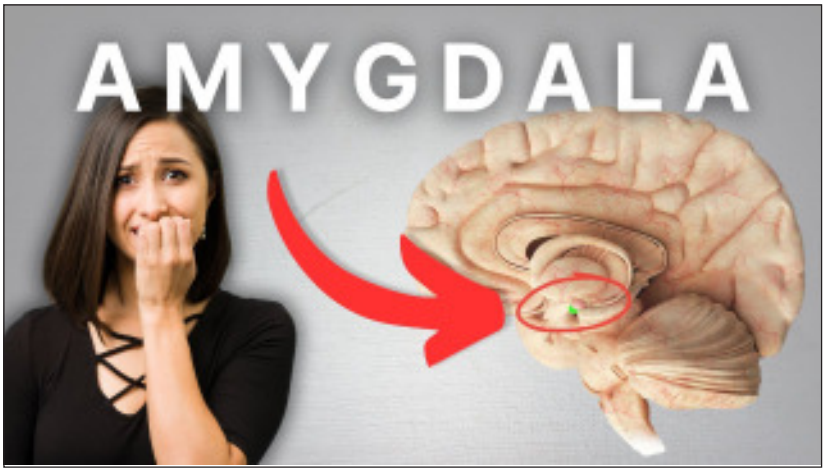

সে কি ছোট বা বড়, মানসিক দিক থেকে বেশ দুর্বল, স্বার্থপর, হীনম্মন্যতাসম্পন্ন দেখা যায়। তাদের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাবও দেখা যায় না। কারণ আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মান ইতিবাচক মনোভাবের ভিত্তি।

ইতিবাচক (পজিটিভ) কীভাবে হওয়া যায়

■ আত্মবিশ্বাস ও আত্মসচেতনতা দরকার। নিজের প্রতি আস্থা যেন থাকে। নিজের দুর্বলতাকে জানতে হবে, তাকে জয় করতে হবে। মনের ইচ্ছা ও লড়াই করার চেষ্টা থাকলেই অনেক অসম্ভব জিনিসকে সম্ভব করা যায়।

■ মনে রাখতে হবে জীবনে জয়–পরাজয়, সুখ–দুঃখ থাকবেই। কিন্তু কোনো খারাপ সময় দীর্ঘস্থায়ী নয়। সুতরাং ধৈর্য হারালে চলবে না। ভালো কিছু করার খিদে যেন থাকে।

■ কোনো কিছু করার সময়, সে লেখাপড়াই হোক, বা খেলাধুলা বা অন্য কোনো কাজ, একাগ্রতা যেন থাকে। মনোসংযোগ খুবই জরুরি। যে কাজ করতে হবে, তাতে মনোসংযোগ দিতে হবে। অন্য কথা বা কাজ ভাবলে চলবে না। কোনো সময় হেরে গেলে হতাশ হলে বা রাগ করলে চলবে না। কারণ খুঁজে পরের বার জেতার জন্য নিজেকে তৈরি করতে হবে। জীবনে পরাজয়ই জয়ের সোপান তৈরি করে। জিততে গেলে হারতে হয়। কিন্তু নেগেটিভ ভাবনা মাথায় নিয়ে বসে থাকলে চলবে না।

■ জীবনে চলার পথে বাধাবিপত্তি বা পরাজয় আসতেই পারে, তাকে অস্বীকার করা, মন ভেঙে বসে থাকা, কপাল বা ভাগ্যকে শুধু দোষারোপ করা ঠিক নয়। ধৈর্য ও সময় অনেক কিছুরই সমাধান করে দেয়। ভালো সময় বা সুযোগের জন্য অপেক্ষা করাটাও 'পজিটিভ' ভাবনার পরিচয়। নিকটজনের মৃত্যু ঘটলে বা কোনো বিপর্যয় ঘটলে দুঃখ, শোক হবারই কথা, সময়ের সাথে সাথে এই শোক, দুঃখ, বিষাদের সময় কেটে যায়। মনের 'নেগেটিভ' ভাব আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে যায়। জোর করে সব ঘটনা বা সব বিষয়ে 'পজিটিভ' হবার চেষ্টা কিন্তু সমীচীন নয়। একে 'টক্সিক পজিটিভ' বলা হয়। মাত্রাতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় 'ইতিবাচক মনোভাব' অনেক সময় সমস্যা তৈরি করে, সম্পর্কের অবনতি ঘটায়।

■ পারিপার্শ্বিক অবস্থা, পরিবার ও কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের আচার–আচরণের প্রভাব, শারীরিক অসুস্থতা ও দুর্বলতা, নেশার বস্তুর প্রভাব ইত্যাদি একজনের মনের ওপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলে থাকে। সে ইতিবাচক বা নেতিবাচক মনোভাবের হবে তা নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। সঙ্গের দোষও থাকে আবার গুণও থাকে। 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে নরকবাস' কথাটি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। 'পজিটিভ' মনের মানুষদের সঙ্গে মিশলে, সময় কাটালে তার প্রভাব জীবনে পড়বে, কখনও অস্বীকার করা যায় না। আবার যারা হতাশ, দুর্বল, যাদের মানসিক দৃঢ়তা ও একাগ্রতা নেই, তারা স্বভাবতই 'নেগেটিভ' মনের মানুষ হয়ে থাকে, তদের প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া যায় না। 'ইতিবাচক' মনোভাব কোনো 'ব্রান্ডেড প্রোডাক্ট' নয় যে অনলাইনে অর্ডার করে বা বড় শপিং মলে পাওয়া যাবে! ইতিবাচক হতে হলে নিজেকে তৈরি করতে হবে। মানসিক দৃঢ়তা, একাগ্রতা ও সাহসই মানুষকে 'পজিটিভ' করে তোলে, এ কথা ভুললে চলবে না। ❑

হ্যালুসিনেশন : মায়া জগৎ

ডঃ শম্পা ঘোষ
(সাইকোলজিস্ট ও কাউন্সেলর)
মোবাইল : ৯৭৭৫১২১৪৬০

হ্যালুসিনেশন হল সম্পূর্ণ কাল্পনিক এক উপলব্ধিগত বিষয়। যার অস্তিত্ব নেই কিন্তু কল্পনায় টের পাওয়া যায় তার অস্তিত্ব। এটি মনোরোগের সাথে সম্পর্কিত বিষয় হতে পারে আবার কিছু অস্থায়ী পরিস্থিতির কারণেও হ্যালুসিনেশন হতে পারে। হ্যালুসিনেশন শব্দটি ইংরেজি ভাষায় ১৬৪৬ সালে ১৭ শতকের চিকিৎসক স্যার থমাস ব্রাউন দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল, ল্যাটিন শব্দ আলুসিনারি থেকে যার অর্থ মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করা, ব্রাউন-এর মতে, হ্যালুসিনেশন হল এক ধরনের দৃষ্টি যা বিকৃত এবং ভুলভাবে তার বিষয়গুলি গ্রহণ করে।

হ্যালুসিনেশনের লক্ষণগুলি প্রকার ও তীব্রতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়।

- অস্তিত্ব নেই এমন জিনিস দেখা বা শোনা।
- চেকে সংবেদন অনুভব করা যা বাস্তব নয়।
- অস্বাভাবিক স্বাদ বা গন্ধ অনুভব করা।
- হ্যালুসিনেশন দ্বারা বিভ্রান্ত বা মন খারাপ বোধ করা।
- কল্পনা এবং বাস্তবের মধ্যে পার্থক্য করতে পারার অসুবিধা।
- ঘুমের অসুবিধা।
- খিচুনি।
- ডিমেনশিয়া বা স্মৃতিভ্রংশতার অসুবিধা।

মস্তিষ্কের ওপর হ্যালুসিনেশনের প্রভাব

কোনো ব্যক্তির হ্যালুসিনেশন হলে এতে তার মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ সাড়া দেয়। ফলে সে নানা রকম অস্বাভাবিক ও অবাস্তব অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করে। যেমন মস্তিষ্কের প্রাইমারি ভিজুয়াল কর্টেক্স সেরিব্রাল পারসেপচুয়াল সেন্টারস সক্রিয় হয়, মস্তিষ্কে ডোপামিন ও সেরোটোনিন-এর ভারসাম্যহীনতা দেখা যায়, মস্তিষ্কে লিম্বিক সিস্টেমে তখন ব্যাঘাত ঘটায়। এছাড়াও হ্যালুসিনেশন হলে এটি মস্তিষ্কে অস্বাভাবিক ও অবাস্তব সিগন্যাল পাঠায় যার ফলে বাস্তব ও কল্পনার মধ্যে একটি বিভ্রান্তি তৈরি হয়।

হ্যালুসিনেশনের কারণ

- হিপনাসোজিয়া।
- পেডান কুলার।
- হ্যালুসিনেসিস।
- পারকিনসন রোগ।
- ডিলিউশন।
- লুই বডি ডিমেনশিয়া।
- চার্লস বোনেট সিনড্রোম।
- সিজোফ্রেনিয়া।
- ঘুমের অসুবিধা।
- অ্যালজাইমার, মাদকের নেশা ও প্রত্যাহার।
- মৃগীরোগ।
- মানসিক চাপ।

• নন সিলিয়া ব্লুটেন।

• জ্বর।

কিছু ক্ষেত্রে ব্রেন টিউমার যেকোনো কেন্দ্রীয় গত পদ্ধতিতে হ্যালুসিনেশন করতে পারে, একাধিক ইন্দ্রিয়গত পদ্ধতি ঘটায়, হ্যালুসিনেশনকে মাল্টি মডাল বলা হয় সেক্ষেত্রে।

হালকা ধরনের হ্যালুসিনেশনকে ব্যাঘাত বলা হয় এবং এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইন্দ্রিয়ের সাথে ঘটে থাকে। এগুলি হতে পারে পেরিফেরাল ভিশানে যেমন নড়াচড়া দেখা, হালকা শব্দ, কণ্ঠস্বর শোনা ইত্যাদি। এটি এমন একটি অনুভূতি তৈরি করতে পারে কেউ তাকে দেখছে বা তাকিয়ে আছে সাধারণত বিদ্বেষপূর্ণ উদ্দেশ্যে বলে সে মনে করে।

হিপনাগোজিক হ্যালুসিনেশন এবং হিপনোপম্পিক হ্যালুসিনেশন স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে দেখা হয়। ঘুমিয়ে পড়ার সময় হিপনাগোজিক এবং ঘুম থেকে ওঠার সময় হিপনোপম্পিক হ্যালুসিনেশন দেখা যায়।

হ্যালুসিনেশনের প্রকারভেদ

• **ভিজুয়াল হ্যালুসিনেশন :** এমন বস্তু বা দৃশ্য দেখা যায়, যা উপস্থিত থাকে না বাস্তবে বা অন্যরা দেখতে পায় না।

• **অডিটরি হ্যালুসিনেশন :** কণ্ঠস্বর শব্দ কথোপকথন শোনা, যা ঘটছে তা কিন্তু আসলে বাস্তবে কেউ শুনতে পাচ্ছে না।

• **ঘ্রাণগত হ্যালুসিনেশন :** এখানেও কোনো অস্তিত্ব থাকে না। এগুলি আনন্দদায়ক বা অপ্রীতিকর হতে পারে। বিভ্রান্তি বা অস্বস্তি সৃষ্টি করতে পারে।

• **স্পর্শকাতর হ্যালুসিনেশন :** শারীরিক যোগাযোগ বা ত্বকে নড়াচড়ার অনুভূতি বোঝায় যা আসলে ঘটে না। যেমন ত্বকের নিচে পোকামাকড়ের হামাগুড়ি দেওয়ার অনুভূতি।

• **গুসট্যাটোরি হ্যালুসিনেশন :** এমন কিছু স্বাদ গ্রহণ করে যা আসলে মুখে নেই।

• **কমান্ড :** এটি কমান্ডের আকারে হ্যালুসিনেশন, বাইরের উৎস থেকে আসে বলে মনে হয়। অথবা মাথা থেকেও আসতে পারে হ্যালুসিনেশন। বিষয়বস্তু নিরীহ থেকে শুরু করে নিজের বা অন্যদের ক্ষতি করার জন্য কমান্ড পর্যন্ত হতে পারে। এটি সিজোফ্রেনিয়ার সাথে যুক্ত হয়ে থাকে প্রায়শই। কমান্ডগুলি মৃদু নির্দেশিকা বা আদেশের মতো হয়।

• **আনন্দের :** এই ধরনের হ্যালুসিনেশন হলো উদ্দীপনা ছাড়াই সাধের অনুভূতি যা সাধারণত অদ্ভুত অপ্রীতিকর নির্দিষ্ট ধরনের ফোকাল, মৃগী রোগীদের মধ্যে তুলনামূলক এগুলি সাধারণ।

• **যৌন :** যৌন হ্যালুসিনেশন হল ইরোজেনাস বা অর্গাজনিক উদ্দীপনার উপলব্ধি। এগুলি একমুখী বা বহুমুখী প্রকৃতির হতে পারে। অর্গাজম অনুভব করা, স্পর্শ অনুভূতি, যৌনাঙ্গে উদ্দীপনা অনুভব করা, যৌন কার্যকলাপের সাথে যুক্ত স্বাদ বা গন্ধ এই শ্রেণীবিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

• **সোমাটিক :** সোমাটিক হ্যালুসিনেশনকে বুঝতে গেলে আরো চারটি উপশ্রেণীকে বুঝতে হবে।

■ **সেনোস্টাপ্যাথিক :** এই হ্যালুসিনেশন হল শরীরের অস্তিত্বের অর্থে একটি রোগগত পরিবর্তন যা অস্বাভাবিক শারীরিক সংবেদন দ্বারা সৃষ্ট। সাধারণ প্রকাশের মধ্যে রয়েছে শরীরের সিস্টেমের চাপ যেমন জ্বালাপোড়া ইত্যাদি। সিজোফ্রেনিয়াকেও উপপ্রকার হিসেবে এর মধ্যে চিহ্নিত করা যায়।

■ **কাইনেস্থেটিক :** শরীরের প্রকৃত নড়াচড়া ছাড়াই অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নড়াচড়ার অনুভূতি।

■ **অ্যালজেসিক :** একটি সংবেদনশীল হ্যালুসিনেশন পদ্ধতি, ব্যথার উপলব্ধিকে বোঝায় ব্যথা ছাড়াই।

■ **সাধারণ :** একে নির্দিষ্ট শ্রেণীবদ্ধ করা যায় না। একজন ব্যক্তি অনুভব করেন তার শরীর বিকৃত হচ্ছে, পেট থেকে কিছু বেরিয়ে যাচ্ছে, মলদ্বারে সাপ ঢুকে বসে আছে, নাকটা বেঁকে পেটের মধ্যে ঢুকে গেছে ইত্যাদি। এই ধরনের অনুভূতি হ্যালুসিনেশনের অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

নিজের মধ্যে যখন বাস্তবের সংযোগের অভাব ঘটবে এবং কোথাও একটা অসামঞ্জস্যতা অনুভব করবে ব্যক্তি তখনই নিজেই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। হ্যালুসিনেশনের লক্ষণগুলি প্রাথমিক পর্যায়ে নিজেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চিকিৎসা ও মনোচিকিৎসা অর্থাৎ ওষুধ ও কাউন্সেলিং অবশ্যই প্রয়োজন এই সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। কারণ দৈনন্দিন চাপ থেকে নিজের ভেতরকার না বলতে পারা জটিলতা , অব্যক্ত অনুভূতি, মানসিক ও বিভিন্ন শারীরিক রোগ এই সমস্যাকে তৈরি করে । হ্যালুসিনেশন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোনো না কোনো মানসিক রোগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। তাই এই সমস্যাগুলিকে অবহেলা করবেন না, সতর্ক হোন। সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন। ❑

আপনি কি জানেন

সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণে পুং জননকোষের ভূমিকাই শুধু আছে, স্ত্রীর কোনো ভূমিকাই নেই। সন্তান ছেলে কী মেয়ে হবে, তা মায়ের ওপর তথা তাঁর ডিম্বকোষের ওপর নির্ভর করে না—নির্ভর করে স্বামী অথবা পরুষের জননকোষের ওপর।

জনস্বার্থে সুস্বাস্থ্য কর্তৃক প্রচারিত

ক্যানসারকে ভয় পাবেন না

ডাঃ স্বপনকুমার গোস্বামী
মোবাইল : ৯৮৩০৮৯৩২৩২

২০১৮ সালে পৃথিবী জুড়ে প্রায় সাড়ে নয় মিলিয়ন মানুষের ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছিল। এই সংখ্যাটা প্রতি বছরই বেড়ে যাচ্ছে। এই হিসেব মতো প্রতি দিন ২৬০০০ রোগীর ক্যানসারের কবলে পড়ে অকাল মৃত্যু হচ্ছে। আর এই মৃত্যুর কারণ যতটা না অসুখের সংক্রমণ, তার চেয়ে বেশি অজ্ঞতা বা ক্যানসার সম্বন্ধে অসচেতনতা।

এজন্য সারা পৃথিবী জুড়ে ''ইউনিয়ন ফর ইন্টারন্যাশনাল ক্যানসার কন্ট্রোল'' প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসের চার তারিখে একটি থিম বা শ্লোগান তুলে ধরে সেটি বিশ্বজুড়ে প্রচার করে। যাতে সাধারণ মানুষ সচেতন হয়,ক্যানসারের ছোটখাট লক্ষণগুলি যাতে চোখ এড়িয়ে না যায়। যেমন ২০০৭ সালের থিম ছিল–'টুমোরোজ ওয়ার্ল্ড, টুডেজ্ চিলড্রেন'। ২০১৩ সালের থিম– 'ডেড অ্যান্ড নো ক্যানসার'। ২০১৬, ২০১৭, ও ২০১৮, এই তিন বছর ধরে একটাই থিম ছিল 'আই ক্যান ইউ ক্যান'।

২০১৯ সালের থিমে ক্যানসারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে বলা হয়—'আই অ্যাম অ্যান্ড আই উইল'। বিষয়টির একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন—আপনি কে এবং আপনি ক্যানসারের প্রতিরোধের জন্য কী করতে পারেন । যেমন—'আই অ্যাম এ কর্পোরেট লিডার, অ্যান্ড আই উইল স্প্রেড দ্য ওয়ার্ল্ড, অথবা 'আই অ্যাম এ ট্রান্সলেটর, অ্যান্ড আই উইল হেলপ ট্রান্সলেট দ্য ওয়ার্ল্ড ক্যানসার ডে মেটেরিয়াল'।

ক্যানসার প্রতিরোধ করতে সাধারণ কয়েকটি জিনিসের দিকে সজাগ দৃষ্টি দিলে অনেক সময়েই বিপর্যয় এড়ানো যায়। সিগারেট, গুটখা, পানমশলা, জর্দা, খৈনি একেবারেই এড়িয়ে চলুন। মদ খাওয়া বন্ধ করুন। ক্যানসারের প্রাথমিক

ক্যানসার মানেই মৃত্যু নয়। ক্যানসার নিয়েও বহুদিন বেঁচে থাকা যায়। মনীষা কৈরালার উদাহরণ হাতের কাছেই। ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়া মানেই মৃত্যু পরোয়ানা নয়। এ কথাটা মনে রাখতেই হবে।

লক্ষণ গুলি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকুন। ক্যানসার রোগীদের সঙ্গে কথা বলে জানুন তার কীভাবে সংক্রমণ হয়েছে, তার কোথায় ভুল হয়েছে, কেন তার রোগ এত বেড়ে গেল ইত্যাদি। এজন্য একেবারে স্কুল স্তরে ছাত্র–ছাত্রীদের ক্যানসার রোগ ও তার লক্ষণ সম্বন্ধে অবহিত করাতে হবে। বক্তৃতা, রচনা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এই নিয়ে প্রচার চালাতে হবে । বিড়ি, সিগারেট, মদ খাওয়ার কুফল নিয়ে আলোচনা করতে হবে। বোঝাতে হবে ক্যানসার কী।

২০২৫ থেকে ২০২৭ সাল পর্যন্ত ক্যানসার দিবসের থিম, 'ইউনাইটেড বাই ইউনিক'। প্রত্যেক ক্যানসার রোগীর অভিজ্ঞতা, অনুভুতি, সব ভাগ করে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। ক্যানসারের রোগীদের প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা আলাদা। প্রত্যেকের অনুভূতি, মানসিক ক্ষমতাও একে অন্যের থেকে আলাদা। সকলের অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে এই রোগের বিরুদ্ধে এগিয়ে যেতে হবে। ক্যানসার সাপোর্ট গ্রুপে প্রতিটি রোগীকে মনের জোর বাড়িয়ে সুস্থতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

ক্যানসার হল শরীরের কিছু বেয়াড়া কোষের অস্বাভাবিক কাজকর্মের ফল । কিছু কোষ হঠাৎ কোনো কারণে দ্রুত বেড়ে গিয়ে বিপত্তি ঘটায়। ক্যানসার ছোঁয়াচে নয়, মাত্র ৫ থেকে ১০ শতাংশ বংশগত, বাকি হল দেহের জিনের মিউটেশনের কারণে। তামাক জাতীয় দ্রব্য, মদ খাওয়াস এবং সুষম খাবার না খাওয়া, দূষণ ও কিছু রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শে থাকলে ক্যানসার হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। ক্যানসার দেহের যে কোনো অঙ্গে হতে পারে। স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, নিয়মিত ব্যায়াম, জাঙ্ক ফুড না খাওয়া, খাদ্য তালিকায় ফল ইত্যাদি রাখা, তামাক, মদ পরিহার সাধারণ ভাবে ক্যানসারকে দূরে রাখে। কোনো ক্যানসার খুব আস্তে আস্তে বাড়ে, কোনোটা অতি দ্রুত জীবনী শক্তি কেড়ে নেয় । মনে রাখতে হবে ক্যানসার মানেই মৃত্যু নয়। ক্যানসার নিয়েও বহুদিন বেঁচে থাকা যায়। মনীষা কৈরালার উদাহরণ হাতের কাছেই। ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়া মানেই মৃত্যু পরোয়ানা নয়। এ কথাটা মনে রাখতেই হবে। দেহের কোনো উপসর্গ, রক্তক্ষরণ সহসা বৃদ্ধি পাওয়া, আঁচিল বহুদিন পরে হঠাৎ করে দ্রুত বাড়তে থাকলে ডাক্তারের শরণাপন্ন হবেন । ক্যানসারকে ভয় পাবেন না। ক্যানসার নিয়ে সচেতন হোন।❑

চিকেন পক্স হলে শিশুদের ক্ষেত্রে বা বেশি জটিলতা না থাকলে সাধারণত কোনও ওষুধ দেওয়া হয় না। অনেকেই অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ লেখেন, তবে তা ব্যবহারের তেমন কোনো যৌক্তিকতা নেই। কারণ অ্যান্টিভাইরাল ওষুধগুলি যে সময় বেশি কাজ করে অর্থাৎ উপসর্গ শুরু হওয়ার প্রথম এক দু'–দিনের মধ্যে, সেই সময় সাধারণত রোগ ধরাই পড়ে না।

চিকেন পক্স : একদম হালকা ভাবে নেবেন না

ডাঃ কুণাল ভট্টাচার্য
মোবাইল : ৯৮৩১৪২১৬৯৬,
৯০৩৮৯৮১৯৪০

প্রচলিত একটি ধারণা হল চিকেন পক্স, চলতি ভাষায় জল বসন্তের হাত থেকে কারো ছাড় নেই অর্থাৎ জীবনে একবার হবেই। এর থেকেই বোঝা যায় রোগটি কতটা ছোঁয়াচে। বাস্তবে চিকেন পক্স একটি অ্যাকিউট ও অত্যন্ত সংক্রামক রোগ। এই সংক্রমণের পেছনে দায়ী একটি ভাইরাস ভেরিসেলা জস্টার। এই একই ভাইরাস থেকে রোগী হারপিস রোগেও আক্রান্ত হন। তবে পার্থক্য এই যে, চিকেন পক্স হচ্ছে এই ভাইরাসের অ্যাকিউট আক্রমণাত্মক অবস্থার প্রতিফলন। আর হারপিস হচ্ছে এই ভাইরাসের সুপ্ত অবস্থার পুনঃ সক্রিয়করণ। কারোর শরীরে চিকেন পক্স ভাইরাস ঢুকে উপসর্গ তৈরি করার পর যখন রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে তখন যে সেই ভাইরাসও শরীর থেকে সব সময় চলে যায় তা নয়, তারা শরীরের ভিতরে নার্ভগুলোর কাছে ঘাপটি মেরে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করে। এই অপেক্ষার সময়কাল ৩০ থেকে ৪০ বছরও হতে পারে। তারপরে হঠাৎ রোগীর ইমিউনিটি দুর্বল হলে তারা আবার জেগে উঠে রোগ সৃষ্টি করে। এরই নাম হারপিস। হারপিসও ছোঁয়াচে তবে চিকেন পক্সের তুলনায় অনেক কম। চিকেন পক্স সাধারণত বাচ্চাদের বেশি হয় আর হারপিসের প্রকোপ সাধারণত ৪০ বছর বয়সের পরেই। চিকেন পক্স অত্যন্ত কমন রোগ হলেও রোগীকে দুই থেকে তিন সপ্তাহ ভুগিয়ে ছাড়ে, যা বেশ যন্ত্রণাদায়ক। এই সময়কালের পর রোগী নিজে থেকেই সুস্থ হয়ে ওঠে কোনও ওষুধ না খেয়েও।

উপসর্গ

সাধারণত ভেরিসেলা জস্টার শরীরে প্রবেশ করার দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে রোগীর জ্বর আসে, গা হাত–পা মাথায় বেশ ব্যথা থাকে, সর্দি কাশি হয়। এর পরেই চামড়ায় র‍্যাশ বের হতে শুরু করে। প্রথমে বুকে, পিঠে তারপর হাত–পা, মুখ, কানের পেছনে। অনেক সময় চোখ এবং মুখের ভিতরেও র‍্যাশ বার হয়। সেগুলো বেশ যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার। এগুলো প্রথমে দেখতে লাল রঙের, ভিতর গর্ত থাকে।

কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তাতে জল ভর্তি হয়ে যায়। তারপর দু'– তিন দিনের মধ্যে এগুলো ফেটে গিয়ে ক্ষত সৃষ্টি করে এবং শেষে শুকিয়ে গিয়ে খোলস উঠতে থাকে। এগুলোতে খুব চুলকানি হয়। আরম্ভের ১০ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে প্রায় সবগুলো উঠে যায় এবং রোগী সেরে ওঠে। রোগের অ্যাকিউট অবস্থা পাঁচ থেকে সাত দিন থাকে, সেই সময় জ্বর থাকে। রোগের এই অবস্থাটাই সবচেয়ে সংক্রামক। সব বেরিয়ে গেলে জ্বরও কমে যায়, তবে চুলকানির জন্য রোগী খুব কষ্ট পায়। জলবসন্তের গুটি শুকিয়ে আসার পর সাধারণত কোনো দাগ থাকে না। তবে চুলকানির জন্য নখ দিয়ে খোঁটাখুটি করলে চামড়ায় গর্ত হয়ে যেতে পারে যা সারা জীবন থেকে যায়।

রোগ নির্ণয়

সাধারণত জলপূর্ণ গুটির পরিণতি অর্থাৎ তার আবির্ভাব ও পরিবর্তনের লক্ষণগুলো, জ্বর আসার সময়কাল এবং ঘরের মধ্যে বা আশেপাশে প্রতিবেশীদের কারোর এই রোগ হয়েছে বলে শোনা গেলে চিকেন পক্স নির্ণয় করা হয়।

বুক, পিঠ, হাত পায়ে সবচেয়ে বেশি র‍্যাশ দেখা যায় এবং হাতের ও পায়ের তালুতে সবচেয়ে কম।

পরিণতি ও চিকিৎসা

কম বয়সে চিকেন পক্স হলে সাধারণত নির্দোষভাবে সেরে যায়। তবে বড়দের, বিশেষ করে যাদের ইমিউনিটি সংক্রান্ত সমস্যা আছে অর্থাৎ ইমিউনো কম্প্রোমাইজড রোগী, যেমন ক্রনিক কিডনি ডিজিজ, এইডস, ক্যানসার হয়েছে বা কেমোথেরাপি চলছে, ব্লাড সুগার ইত্যাদিতে ভুগছেন তাঁদের এই রোগ গুরুতর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাদের ব্রঙ্কাইটিস, ল্যারিনজাইটিস, সেকেন্ডারি ব্যাক্টেরিয়াল ইনফেকশন, সেলুলাইটিস এরিসেপেলাস, কদাচিৎ গ্যাংগ্রিন ইত্যাদি নানান সমস্যা দেখা দিতে পারে।

এই প্রসঙ্গে হারপিস নিয়েও দুটো কথা বলে রাখা ভালো। এটিরও উৎস ভেরিসেলা জস্টার। হারপিস অনেকগুলি একসঙ্গে এবং ত্বকের একটি নির্দিষ্ট জায়গা জুড়ে হয়। এর চরিত্র চিকেন পক্সের মতোই। জলপূর্ণ, লাল। সাধারণত ৪০ বছর বয়সের পরেই এই রোগ বেশি হয়, বিশেষ করে যাদের কম বয়সে চিকেন পক্স হয়েছিল এবং বিভিন্ন রোগে ভোগার জন্য রোগ প্রতিরোধ

"কম বয়সে চিকেন পক্স হলে সাধারণত নির্দোষভাবে সেরে যায়। তবে বড়দের, বিশেষ করে যাদের ইমিউনিটি সংক্রান্ত সমস্যা আছে অর্থাৎ ইমিউনো কম্প্রোমাইজড রোগী, যেমন – ক্রনিক কিডনি ডিজিজ, এইডস, ক্যানসার হয়েছে বা কেমোথেরাপি চলছে, ব্লাড সুগার ইত্যাদিতে ভুগছেন তাঁদের এই রোগ গুরুতর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।"

ক্ষমতা কমে গেছে। হারপিস হলে র‍্যাশের জায়গায় প্রচন্ড ব্যথা বা জ্বালা হয়, গায়ে জ্বর থাকে তারপর সেগুলি ফেটে রস বেরিয়ে আসে। এই র‍্যাশ থেকে আবার সেকেন্ডারি ব্যাক্টেরিয়াল ইনফেকশন হয়ে পুঁজ, জ্বর হতে পারে। দু তিন সপ্তাহের মধ্যে হারপিস সেরে যায়, কিন্তু জ্বালা, চুলকানি, ব্যথা কয়েক মাস পর্যন্ত থাকতে পারে।

চিকিৎসা

চিকেন পক্স হলে শিশুদের ক্ষেত্রে বা বেশি জটিলতা না থাকলে সাধারণত কোনও ওষুধ দেওয়া হয় না । অনেকেই অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ লেখেন, তবে তা ব্যবহারের তেমন কোনো যৌক্তিকতা নেই। কারণ অ্যান্টিভাইরাল ওষুধগুলি যে সময় বেশি কাজ করে অর্থাৎ উপসর্গ শুরু হওয়ার প্রথম এক দু'–দিনের মধ্যে, সেই সময় সাধারণত রোগ ধরাই পড়ে না। অবস্থা জটিলতর হলে অনেক সময় অ্যান্টিবায়োটিক ইত্যাদি দেওয়া হয়। তবে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ প্রথম থেকেই ব্যবহার করলে এই ধরনের উপসর্গগুলি সাধারণত আসে না বা অনেক কম থাকে। তিনি তত কষ্ট পান না।

হোমিওপ্যাথি দর্শন অনুযায়ী এই রোগ অ্যাকিউট মায়াজমেটিক পর্যায়ভুক্ত এবং এই রোগের নির্দিষ্ট চিকিৎসা আছে। ভেসিকুলার র‍্যাশ, গা হাত পা ব্যথা ইত্যাদি দেখে অনেক সময় রাসটক্স ওষুধটি প্রেসক্রিপশন করা হয়। আমরা চিকেন পক্স ভাইরাস থেকে প্রস্তুত ভ্যারিসেলা নামক ওষুধটি ব্যবহার করে যথেষ্ট ভালো ফল পাই। রোগ জটিলতর হলে অনেক সময়ই লক্ষণ অনুযায়ী পালসেটিলা, হিপার সালফার, সালফার, থুজা ইত্যাদি ওষুধ রোগের সময় কালকে অনেকটাই কমিয়ে আনে। হারপিস পরবর্তী ব্যথা সারাতে রানানকুলাস এল্ব, মেজেরিনাম, ক্যান্থারিস ইত্যাদি অসাধারণ কাজ করে। তবে প্রতিটি ওষুধই লক্ষণ অনুযায়ী দিতে হবে এবং কোন অবস্থায় কী ওষুধ বা তার কত শক্তি দিতে হবে, সেটি একমাত্র একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক ঠিক করতে পারেন। সুতরাং চিকেন পক্স হলে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ গ্রহণ করলে রোগীর কষ্ট অনেকটাই কমানো সম্ভব। ❑

বসন্তের নিদান

ডাঃ ঋত্বিক সেন
মোবাইল : ৯৪৩৩৪৬৫৭৩৭,
৭৯৮০৪২০৮৩৪

ভোরে, গভীর রাতে শীত শীত ভাব। বেলা বাড়তেই চড়ছে পারদ। ভরদপুরে রীতিমতো লাগছে গরম। ঠান্ডা-গরমের এই টানাপোড়েনে অনেকেই ভুগছেন সর্দি, কাশি, জ্বর, চিকেনপক্স এবং অ্যালার্জিতে। জীবাণুর সংক্রমণে রীতিমতো কাহিল আমরা সবাই। ঋতু বদলের এই সময়ে ভাইরাস ও ব্যাক্টেরিয়া বাহিত রোগে আক্রান্তের সংখ্যা অনেক। তাই এই সময় বিশেষ কিছু সতর্কতার প্রয়োজন। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হবে। সাধারণত নাক মুখ দিয়ে সহজেই শরীরে জীবাণু প্রবেশ করে সংক্রমণ তৈরি করে, যা রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা পরতিরোধ করতে পারে না। শরীরে অ্যালার্জির প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। এরপরেও ভাইরাসের সংক্রমণ হতে পারে। শুধু সংক্রমণ নয়, পেটের সমস্যায়ও আক্রান্ত হতে পারে মানুষ। সাধারণত হিউম্যান রাইনো ভাইরাস, ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি. প্যারা-ইনফ্লুয়েঞ্জা, আরএসভি আক্রমণ করে থাকে। এই সময় শুরু হয়ে যায় চিকেন পক্স, শরীরের ত্বক ও চোখে অ্যালার্জি।

■ চিকেন পক্স

চিকেন পক্সের ক্ষেত্রে ভাইরাস আক্রমণ হতে পারে। সাধারণত শিশুদের ক্ষেত্রে আক্রান্তের সংখ্যা বেশি হয়। ভাইরাস আক্রমণের পর শরীরে, গা-হাত-পায়ে তীব্র ব্যথা অনুভূত হয়। হালকা জ্বরের প্রাদুর্ভাব, খিদে কমে যাওয়া, মলত্যাগে অনীহা, কোষ্ঠবদ্ধতা শুরু হয়। গায়ে র‍্যাশ বা চুলকানি শুরু হয়। তিন-চার দিন পরে তা লাল লাল গোটাতে পরিণত হয়। আস্তে আস্তে এক সপ্তাহের ভিতর এই গোটাগুলো শুকিয়ে যেতে থাকে, যা মামড়িতে পরিণত হয় এবং খসে পড়তে থাকে। এইসময় চুলকানি আরো তীব্র হয়ে যায়। অনেক সময় চুলকানির জায়গায় নারকেল তেল লাগালে উপকার হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে আমরা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ ভেরিওলিনাম, থুজা, রাসটক্স প্রভৃতি প্রয়োগ করে থাকি।

■ চোখের অ্যালার্জি

প্রধানত চোখে চুলকানো, চোখ লাল হয়ে যাওয়া, চোখ থেকে জল পড়তে থাকে। সঙ্গে শ্বাসকষ্ট, মাথা ব্যথা, সর্দি ইত্যাদি থাকতে পারে। অনেক সময় এই রোগ বংশগত হতে দেখা যায়। চোখে চুলকানি বেশিদিন থাকলে কর্নিয়ার গঠনগত পরিবর্তন, কর্নিয়াল-আলসার ও দৃষ্টি শক্তির সমস্যা হতে পারে।

অ্যালার্জি দু'রকমের হয়ে থাকে—

- সিজনাল—গ্রীষ্ম ও বসন্ত ঋতুতে দেখা যায়।
- পেরিনিয়াল যা সারা বছর ভোগায়।

ঋতু পরিবর্তনের সময় ওড়া শুষ্ক ফলের রেণু থেকে সিজনাল অ্যালার্জি এবং বাতাসের ধোঁয়া, ধুলো থেকে পেরিনিয়াল অ্যালার্জি হয়ে থাকে। ১৪-১৫ বছরের শিশুদের ক্ষেত্রে চোখে অ্যালার্জি বেশি হয়। বড়দের ক্ষেত্রে চোখে সংক্রমণ, অ্যাটোপিক-কনজাংটিভাইটিস বা চোখ-ওঠা হতে পারে। মহিলাদের প্রসাধনী যেমন কাজল, মাসকারা, আইশ্যাডো, আইলাইনার, পাউডার, চোখের ড্রপ, মলম বা কনট্যাক্ট লেন্স ব্যবহারের সময় এই সংক্রমণ ঘটে থাকে। তাই এই অ্যালার্জি থেকে রেহাই পেতে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে, ভালো করে হাত-পা-মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে ধুতে হবে, এসি ব্যবহার করা যাবে না, পুকুরে স্নান করা যাবে না, হাঁচি-কাশিতে আক্রান্তের থেকে দূরে থাকতে হবে, পর্যাপ্ত জল খেতে হবে যাতে শরীর শুষ্ক না হয়।

হোমিওপ্যাথিক পালসেটিলা, কেলি-কার্ব, আরজেনটাম-নাইট্রিকাম, নেট্রাম-মিউর ইউরেশিয়া খুব ভালো কাজ দেয়। তবে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী খাবেন, নাহলে হিতে বিপরীত হতে পারে। ❑

টিউমারের চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথি

ডাঃ বিকাশ মন্ডল
মোবাইল : ৯৪৩৩৬২৭৩৪৭,
৬২৯১৫২০৯৮৩

শরীরের কোনো কোষ বা তন্তুর নতুন ও অস্বাভাবিক বৃদ্ধিকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়—

- সরল বা নির্দোষ বা বিনাইন।
- মারাত্মক বা ম্যালিগন্যান্ট।

ম্যালিগন্যান্ট দু'প্রকারের, কার্সিনোমা ও সারকোমা। শরীরে কোথাও কোনো স্ফীতি বা ফোলা দৃষ্টি গোচর হলে তাকে প্রাথমিক ভাবে টিউমার বলা হয়। পরে তার গতি-প্রকৃতি পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করে দেখা হয় এটা টিউমার না ক্যানসার। বিজ্ঞানী ও চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা যখন নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন রোগ মুক্তির জন্য।

হোমিওপ্যাথি

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা পদ্ধতি একটি নির্দিষ্ট নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন সিমিলিয়া, সিমিলিবাস, কিউরেপ্টার সদৃশ লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা।

হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকা প্রচুর সম্পদের অধিকারি। এখানে সুস্থ মানুষের ওপর ওষুধ প্রয়োগ করে উৎপন্ন লক্ষণ এবং রোগীর ওপর ওষুধ প্রয়োগ করে যে সব লক্ষণ অপসারিত হল তা লিপিবদ্ধ করা আছে। রোগীর লক্ষণের সঙ্গে মেটিরিয়া মেডিকার ওষুধের লক্ষণের সদৃশ ওষুধ প্রয়োগে রোগ আরোগ্য হয়। ওষুধ প্রয়োগ ও নির্বাচন পদ্ধতি হোমিওপ্যাথির জনক মহাত্মা হ্যানিম্যানের লেখা 'অর্গানন অফ মেডিসিন' এবং হোমিওদর্শনের ওপর নির্ভরশীল।

হোমিওপ্যাথ রোগীর চিকিৎসা করে, রোগের নয়। হোমিওপ্যাথিতে টিউমার বা ক্যানসার রোগীর জন্য আশার আলো আছে কিন্তু ক্যানসারের জন্য কিছু নেই।

ক্যানসার চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন দলবদ্ধ প্রচেষ্টা, গভীর বোঝাপড়া এবং হোমিওপ্যাথিক

পড়াশোনা।

হোমিওপ্যাথি মতে, রোগ জীবনী শক্তির সুসামঞ্জস্যতার অভাব। জীবনীশক্তি একটা জটিল ফিজিও-নিউরো এন্ডোক্রিনো মেকানিজম, যা মানুষের দেহ মন ও ইন্দ্রিয়াদিকে একটা সুসামঞ্জস্য গতিতে পরিচালিত করছে। যদি কোনো কারণে জীবনীশক্তির সুসামঞ্জস্যতা বিঘ্নিত হয়, তখন অস্বাভাবিক অনুভূতি, ক্রিয়া ও অস্বাচ্ছন্দ প্রকাশ পায়। যাকে আমরা বলি রোগাক্রান্ত বা অসুস্থ অবস্থা। কোনো জীবন-বিরোধী রোগ উৎপাদক সূক্ষ্ম শক্তি দ্বারা বিকৃত জীবনীশক্তির বহিঃপ্রকাশ নানাভাবে, নানা যন্ত্রে প্রকাশ পায়। আর তাদের চিহ্নিত করার জন্য নানা নামে নামকরণ করা হয়। যেমন নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস, গ্যাসট্রিক আলসার, ক্যানসার, টিউমার, জনডিস প্রভৃতি। সুতরাং টিউমার বা ক্যানসার হল বিকৃত বা আক্রান্ত জীবনীশক্তির বহিঃপ্রকাশ।

হোমিওপ্যাথি মতে, টিউমার—সোরা, সিফিলিস ও সাইকোসিস, এই তিন মায়াজমের বিষ দ্বারা উৎপন্ন হয়। সোরা ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এবং অপর দুই মায়াজম জন্মসূত্রে অর্থাৎ বংশসূত্রে শরীরে অর্জিত হয়। রোগীর সাসেপ্টিব্লিটি ও সেনসিটিভিটির ওপর নির্ভর করে ক্যানসার শরীরের যে কোনো অংশে বা সমগ্রভাবে হতে পারে। ক্যানসার একটি সমষ্টিগত সমস্যা কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে এটি একটি ব্যক্তিচ সমস্যা।

উৎপত্তিগত ভাবে আবরণীকলার বৃদ্ধিকে কারসিনোমা এবং যোগকলার বৃদ্ধিকে সারকোমা বলা হয়। যে তন্তু থেকে উৎপন্ন, তার শেষে 'ওমা' যুক্ত করে বিনাইন টিউমার এবং কারসিনোমা ও সারকোমা যুক্ত করে ম্যালিগন্যান্ট টিউমার চিহ্নিত করা হয়।

উদাহরণ—

উৎপত্তি : ফাইব্রাস টিস্যু।

বিনাইন : ফাইব্রোমা।

ম্যালিগন্যান্ট : ফাইব্রোসারকোমা।
উৎপত্তি : ফ্যাটি টিস্যু।
বিনাইন : লাইপোমা।
ম্যালিগন্যান্ট : লাইপোসারকোমা।
উৎপত্তি : অস্থি।
বিনাইন : অস্টিওমা।
ম্যালিগন্যান্ট : অস্টিওসারকোমা।
উৎপত্তি : কার্টিলেজ।
বিনাইন : কন্ড্রোমা।
ম্যালিগন্যান্ট : কন্ড্রো সারকোমা।
উৎপত্তি : নার্ভসিথ।
বিনাইন : নিউরোফাইব্রোমা।
ম্যালিগন্যান্ট : নিউরো ফাইব্রোসারকোমা।
উৎপত্তি : স্কোমাস এপিথেলিয়াম।
বিনাইন : প্যাপিলোমা।
ম্যালিগন্যান্ট : স্কোয়ামাস সেল কার্সিনোমা।
উৎপত্তি : ফাইব্রাস টিস্যু।
বিনাইন : ফাইব্রোমা।
ম্যালিগন্যান্ট : ফাইব্রোসারকোমা।

মিক্সড টিউমার একাধিক ভ্রূণস্তর থেকে উৎপন্ন। যেমন টেরাটোমা, ডারময়েড।

যারা ধূমপান করেন, তাদের থেকে পলিসাইক্লিক অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন (পিএএইচ) নামক এক প্রকারের জৈব পদার্থ ধোঁয়ার সঙ্গে প্রবেশ করে যা এবিল হাইড্রোকার্বন অক্সিজিনেজ নামক এনজাইমের প্রভাবে

কারসিনোজেন হিসেবে কাজ করে ফুসফুসে ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে।

হোমিওপ্যাথি

- টিউমার যা দ্রুত বেড়ে চলেছে।
- অস্বাভাবিক স্রাব বা রক্তক্ষরণ, যেমন মুখ, নাক, মলদ্বার, জরায়ু প্রভৃতি স্থান থেকে।
- অনেক দিন ধরে যে ঘা বা ক্ষত সারতে চায় না।
- ক্ষুধামান্দ, খেতে অসুবিধে বা বদহজম।
- মল-মূত্র ত্যাগের অভ্যাস পরিবর্তন।
- বিরক্তিকর শুকনো কাশি ও স্বরভঙ্গ প্রভৃতি।

ওপরের লক্ষণগুলো যদি বেশ কিছুদিন যাবৎ চলতে থাকে, অবশ্যই স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

ওষুধ দ্বারা টিউমারের চিকিৎসা

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় টিউমারের অনেক ওষুধ আছে। রোগীর লক্ষণ অনুযায়ী সদৃশ লক্ষণযুক্ত মেটেরিয়া মেডিকার বর্ণিত যে কোনো ওষুধ চিকিৎসায় আসতে পারে। তাদের মধ্যে অধিক ব্যবহৃত ওষুধগুলো হল থুজা, নাইট্রিক অ্যাসিড, আর্নিকা মন্ট, ফসফরাস, মেডোরিনাম, মার্কসল, রুটা, অরাম মিউর, সোরিনাম, টিউবার কুলিনাম, লাইকোপোডিয়াম, ক্যালকেরিয়া ফ্লোর, গ্যালিয়াম অ্যাপ, সিনফাইটাম প্রভৃতি। ❑

শিশুদের পরিচর্যা

শারীরিক ও মানসিক

শিশুদের পরিচর্যা নিয়ে বাংলাভাষায় প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। কিন্তু শুধুমাত্র শারীরিক পরিচর্যা কি একটা শিশুর বেড়ে ওঠার পক্ষে যথেষ্ঠ? তা বোধহয় নয়। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে এটা প্রমাণিত সত্য যে একমাত্র উপযুক্ত শারীরিক ও মানসিক বিকাশের মাধ্যমেই পরিপুষ্ট হয় শিশু। আর এখানেই বিশেষত্ব শিশুদের পরিচর্যা-বইয়ের। মানসিক রোগের মহামারির সামনে দাঁড়িয়ে সুস্থ শিশু গড়ে তোলার একটা অসাধারণ বই ডাঃ মৈত্রেয়ী চক্রবর্তীর।

নিছক বই নয়, শিশুকে গড়ে তোলার গাইডলাইন।

মূল্য ২০০টাকা

> খাদ্য বিশেষজ্ঞ এবং চিকিৎসকদের মতে বিভিন্ন ধরনের ফাস্টফুডের মধ্যে সোডিয়াম, চিনি ইত্যাদির পরিমাণ স্বাভাবিক খাবার দাবারের চেয়ে একটু বেশি মাত্রায় থাকে বলে সেটা শরীরের পক্ষে ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠে। আবার থাকে অতিরিক্ত লবণ, স্যাচুরেটেড বা ট্রান্সফ্যাটও। তাই কখন যে কী ধরনের বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে সেটা সবসময় বোঝাও সম্ভব নয়।

মনের দুয়ারে ফাস্টফুড ঘরের দুয়ারে যমদূত

ডাঃ শামসুল হক
মোবাইল : ৭৫০১৭৯৪৯৬৫

মানবদেহের অতি আবশ্যিক কয়েকটা অংশের মধ্যে গলব্লাডারের ভূমিকা যে ঠিক কতখানি সেটা আর নতুনভাবে বোঝাবার প্রয়োজন পড়ে না। আমরা সারাদিন যে সমস্ত খাদ্য গ্রহণ করি গলব্লাডার ছাড়া তার পরিপাক ক্রিয়া সঠিকভাবে সম্পন্ন হওয়া যে কোনো ভাবেই সম্ভব নয় সেটা প্রমাণ করেছে চিকিৎসা বিজ্ঞান।

পিত্তাশয় নামেই সাধারণভাবে সেটা পরিচিত সকলের কাছে। একজন মানুষের যকৃত অর্থাৎ লিভারের ডান পাশে একটু নীচের দিকে তার অবস্থান এবং সেটা পোর্টাহেপাটিকের ডান প্রান্ত থেকে লিভারের নিম্নাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। মোটামুটিভাবে দৈর্ঘ্যে সেটা হতে পারে আট থেকে দশ সেন্টিমিটার এবং প্রস্থে মোটামুটি তিন সেন্টিমিটার। আমরা সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত যে সমস্ত খাদ্য গ্রহণ করে থাকি সেগুলোর পরিপাক সঠিকভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য যে পিত্তরসের প্রয়োজন হয় সেটার যোগান দেয় কিন্তু ওই পিত্তাশয় অর্থাৎ গলব্লাডার। আবার সব ধরনের খাদ্য বস্তুকে হজম করার জন্য সেই থলিতে পরিপূর্ণ থাকে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিলি লিটার পর্যন্ত পিত্ত রস।

একজন মানুষের শরীর এবং মনকে চনমনে রাখার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন পরিপাক ক্রিয়াকে একশো শতাংশ ঠিক রাখা। আর সেই কাজের জন্য সবচেয়ে আগে প্রয়োজন গলব্লাডারকে ষোল আনাই চনমনে রাখা। একজন মানুষ যদি তাঁর দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় সংযম রক্ষার চেষ্টা করেন তাহলে ভালো ফলাফল মিলতে বাধ্য। আর সেটা সম্ভব না হলে দেখা দেবে নানান ধরনের বিপর্যয়।

এই সময়ে আমরা ঠিক কোন ধরনের খাবারের প্রতি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে চলেছি—বর্তমান সময়ে আমরা অনেকটাই নির্ভরশীল হয়ে উঠেছি ফাস্টফুডের প্রতি। আর সেটাই হয়ে উঠেছে আমাদের বিপদের অন্যতম এক কারণ। খাদ্য বিশেষজ্ঞ এবং চিকিৎসকদের মতে বিভিন্ন ধরনের ফাস্টফুডের মধ্যে সোডিয়াম, চিনি ইত্যাদির পরিমাণ স্বাভাবিক খাবার দাবারের চেয়ে একটু বেশি মাত্রায় থাকে বলে সেটা শরীরের পক্ষে ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠে। আবার থাকে অতিরিক্ত লবণ, স্যাচুরেটেড বা ট্রান্সফ্যাটও। তাই কখন যে কী ধরনের বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে সেটা সবসময় বোঝাও সম্ভব নয়। আবার তার মধ্যে খনিজ প্রোটিন, ফাইবারের মতো অতি অপরিহার্য উপাদানের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম হয় বলে

বেড়ে যায় অসুবিধার মাত্রাও। কারণ ফাস্টফুডের সেইসব ত্রুটিবিচ্যুতির ফলশ্রুতিতেই কমে যেতে বাধ্য মানব দেহের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাও। শুধু তাই নয় তার ফলে শরীরের মধ্যে প্রদাহের সৃষ্টিও হতে পারে। বাড়তে পারে ক্যানসারের ঝুঁকিও। আবার এই জাতীয় খাদ্যবস্তুর স্বাদ বৃদ্ধি সহ অনেকদিন পর্যন্ত ব্যবহার উপযোগী রাখার জন্য প্রয়োজন হয় নানান ধরনের রাসায়নিক পদার্থেরও। আর তারই কুফলে মানুষের শরীরের মধ্যে কমতে থাকে ভালো ব্যাকটেরিয়ার প্রভাব। তারা আবার অন্ত্রের মাইক্রোবায়োমের কাজকেও প্রভাবিত করতে থাকে। ফলস্বরূপ মানব দেহের মধ্যে কমতে বাধ্য রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা । আর সেই সুযোগেই শরীরের মধ্যে অতি নিশ্চিন্তেই বাসা বাঁধে নানান ধরনের রোগও।

ফাস্টফুডের প্রকারভেদ এবং হরেক রোগের লক্ষণ

হাটে মাঠে ঘাটে সর্বত্রই এখন যথেচ্ছভাবে বিক্রি হচ্ছে হরেক ধরনের ফাস্টফুড। সস্তার খাবার দামী খাবার এই নিয়ে চলছে নানান প্রতিযোগিতাও। বলাই বাহুল্য, সব শ্রেণীর মানুষজনের কাছে সেইসব খাবার তাই সহজে গ্রহণযোগ্যও হয়ে উঠেছে। কিন্তু ফলাফল হিসেবে অনেক সময় মিলছে অপ্রত্যাশিত অনেক দুঃ-সংবাদও। আর তার মধ্যে এই মুহূর্তে পিত্ত পাথরের সমস্যাই সবচেয়ে বেশি ভাবিয়ে তুলেছে আমাদের।

পিত্তথলিতে বিলিরুবিন, পিত্ত কোলেস্টেরল ইত্যাদির মতো উপাদান জমে জমেই পাথর হতে পারে। যদি পিত্তথলি ভালোভাবে খালি হতে না পারে বা শরীরের আকৃতি একটু মোটাসোটা হলে হতে পারে সেই সমস্যা। আবার হঠাৎ করে শরীরের ওজন কমে গেলেও বাড়তে পারে পাথর জমার প্রবণতা। বয়স পঞ্চাশ অতিক্রম করলেও অনেক সময় দেখা দিতে পারে এই সমস্যা। আর পাথর সৃষ্টির সবচেয়ে বড় কারণটা হল ক্যালরি সমৃদ্ধ এবং কার্বোহাইড্রেট যুক্ত খাবার কম পরিমাণে গ্রহণ করাও। বিবাহিত মহিলারা এই রোগে আক্রান্ত হন একটু বেশি বেশিই। অধিকাংশ মহিলাই তাঁদের নিজের ইচ্ছে মতো গ্রহণ করে থাকেন জন্ম নিয়ন্ত্রণের পিল এবং সেটাও হতে পারে এই উপসর্গের অন্যতম একটা কারণ।

সমস্যা দেখা দিলে প্রাথমিকভাবে করণীয়

পিত্তথলিতে পাথর সৃষ্টি হলে প্রাথমিকভাবে সেটা তেমন একটা বোঝাও যায় না । তবে পেটের নিচের দিকে ডান প্রান্ত ঘেঁষে ব্যথা অনুভূত হতে পারে। সেই ধরনের সমস্যা পরিচিত পিত্তশূল নামেই। সেই ব্যথা অনেক সময় অবশ্য কিছুক্ষণ পর কমেও যায়। কিন্তু সেটা যদি দীর্ঘায়িত হয় তাহলে কিছু একটা ভাবতেই হবে। তখন কালবিলম্ব না করে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতেই হবে। আবার যদি বমি বমি ভাব দেখা দেয় এবং জ্বর আসে, বা প্রস্রাবের বিবর্ণতা দেখা যায় তাহলে আরও সতর্ক হতে হবে।

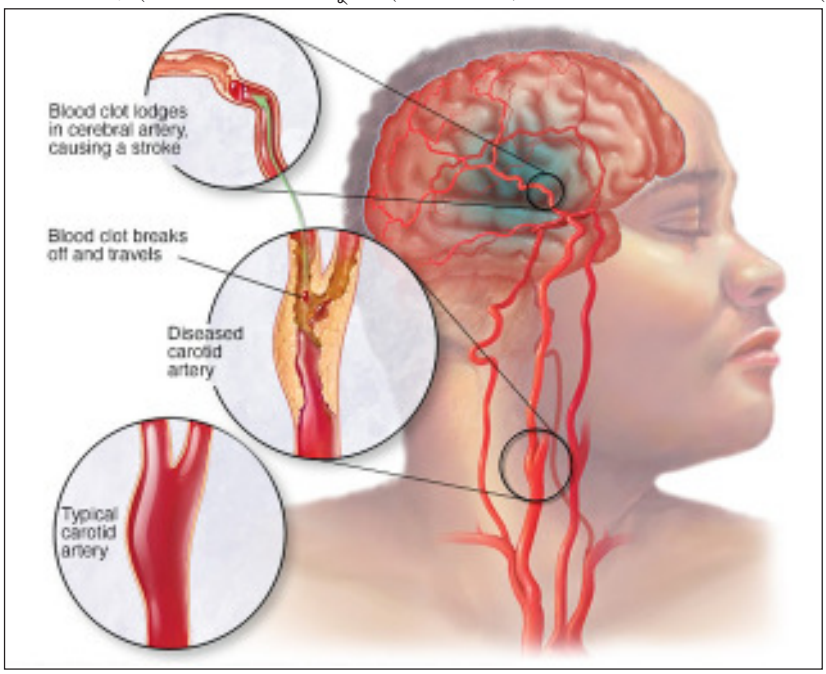

পাথরের প্রকারভেদ

গলব্লাডারে হঠাৎ আবির্ভূত হওয়া এইসব পাথরের আকার ছোট হতে পারে। আবার হতে পারে বড়ও । তবে তাদের আকৃতি যদি পাঁচ মিলিমিটার বা তার চেয়ে কম হয় তাহলে সেগুলো পিত্তনালী দিয়েই চলে যায়। কিন্তু তাদের আকার যদি আট কিংবা দশ মিলিমিটার পর্যন্ত হয়ে যায় তাহলে কিন্তু নালীপথ অবরুদ্ধ করে দিতে পারে। সেটা তখন পেটের ডানদিকে লিভারের নীচে আটকে থাকে। আর পিত্তরসের যে কোনো পরিবর্তনের ফলে পিত্তথলিতে ছোট ছোট নুড়ির মতো পাথরও হতে পারে। তাকে বলে পিত্তথলির পাথর এবং সেটাই সবচেয়ে বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে। ফাস্টফুডের আছে অন্যান্য আরও অনেক উৎপাত। এমনও অনেক ফুড আছে যাদের মধ্যে স্যাচুরেটেড এবং ট্রান্সফ্যাট থাকে একটু বেশি মাত্রায়। আর সেগুলো শরীরের খারাপ কোলেস্টেরলের অর্থাৎ এল.ডি.এল-এর মাত্রা বাড়তে থাকে এবং ডেকে আনে হৃদরোগের সমস্যাও। হতে পারে স্ট্রোক কিংবা কার্ডিয়ো ভাসকুলার সমস্যা। হতে পারে টাইপ-২ ডায়াবেটিসও। আর সোডিয়ামের আধিক্যের কারণে দেখা দিতে পারে উচ্চ রক্তচাপের সমস্যাও। হতে পারে কিডনির রোগ, পাকস্থলীর ক্যানসার সহ আরও অনেক রোগ।

সমস্যা সমাধানে সবুজ বনস্পতি

আমাদের চোখের সামনে সদা সর্বদাই দৃশ্যমান হরেক ধরনের গাছগাছালি এই রোগের প্রতিরোধের কাজে ভীষণভাবে সহায়কের ভূমিকাও পালন করে থাকে। কাকমাছি, ভুঁই কুমড়ো, আপাং, সোন্দল, অর্জুন, পুদিনা ইত্যাদি গাছের বিভিন্ন অংশ যদি নিয়মিতভাবে গ্রহণ করা হয় তাহলে সুফল মিলবেই মিলবে। তবে তার আগে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক অথবা বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিলে ভালো হয়। ওটা মিল, গমের আটার রুটি, ছোলার ছাতু ইত্যাদিও খেতে হবে নিয়মিতভাবে। আপেল, নাসপাতি, আঙুর এবং তরমুজ খাওয়ার অভ্যাস রাখতে হবে। গাজর, লাউ, শালগম, মুলো, মুসুর ডাল,মটরশুঁটি ইত্যাদিও রাখতে হবে খাদ্যতালিকায়। ❑

হৃদরোগে ভেষজের ব্যবহার

এম. দাশ

হৃদরোগ বা কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ। বিশ্বব্যাপী মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ। মূলত হৃৎপিণ্ড ও রক্তনালীর সমস্যার কারণে ঘটে। তবে প্রাচীনকালে মানুষ এই হৃদরোগের চিকিৎসা এবং প্রতিরোধে ভেষজের ওপর নির্ভর করতেন। সেই ভেষজ চিকিৎসা এখনও বিভিন্ন অঞ্চলে হৃদরোগের সমস্যায় ব্যবহার করা হয়।

হৃদরোগের ধরণ

হৃদরোগ এমন একটি অবস্থা যেখানে হৃৎপিণ্ড স্বাভাবিকভাবে কাজ করত না। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত—করোনারি হার্ট ডিজিজ অর্থাৎ হৃদপিণ্ডের ধমনীতে চর্বি জমে রক্ত প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করা। হার্ট ফেইলিওর অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড যখন পুরোপুরি রক্ত পাম্প করতে পারে না। এছাড়া এরিথমিয়া বা অনিয়মিত হার্টবিট, হার্ট ভালভ বা হৃদপিণ্ডের ভালভে সমস্যা।

হৃদরোগের কারণ

হৃদরোগের প্রধান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে—

- ধূমপান।
- অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস।
- স্থূলতা।
- উচ্চ রক্তচাপ।
- ডায়াবেটিস।
- মানসিক চাপ।

ভেষজ চিকিৎসা

ভেষজ চিকিৎসায় উদ্ভিদ, তাদের মূল, পাতা, ফল এবং ফুল ব্যবহৃত হয়। এটি প্রাচীন কাল থেকে চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং এখনো এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

হৃদরোগ প্রতিরোধ ও উপশমে বিভিন্ন ভেষজ কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। এর মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভেষজের বিবরণ দেওয়া হল—

তুলসি

- **অর্জুন (টার্মিনালিয়া অর্জুনা) :**

অর্জুন গাছের ছাল হৃদরোগ চিকিৎসায় অত্যন্ত কার্যকর। এতে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি এবং কার্ডিওপ্রোটেকটিভ গুণাগুণ রয়েছে।

ব্যবহার : অর্জুনের ছাল থেকে তৈরি চা বা গুঁড়ো প্রতিদিন সেবন করলে হৃদপিণ্ডের কার্যক্ষমতা বাড়ে। এটি উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে।

- **রসুন (গার্লিক) :**

রসুন হৃদরোগ প্রতিরোধে খুবই উপযোগী। এতে অ্যালিসিন নামক উপাদান রয়েছে যা রক্তে কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে।

মেথি

ব্যবহার : প্রতিদিন কাঁচা রসুনের একটি কোয়া খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। এটি রক্ত পাতলা করে এবং রক্ত প্রবাহ বাড়ায়।

- **আদা (জিঞ্জার) :**

আদার অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সহায়ক।

ব্যবহার : আদার চা বা আদাগুঁড়ো খাদ্যে মিশিয়ে সেবন করা যেতে পারে। এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং রক্তনালীর কার্যকারিতা উন্নত করে।

- **তুলসি (হলি বাসিল) :**

তুলসির পাতা প্রাকৃতিক অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং স্ট্রেস কমাতে কার্যকর।

ব্যবহার : তুলসির পাতা চিবানো বা তুলসি চা পান করলে হৃদযন্ত্রের ভালো থাকে।

- **মেথি (ফেনুগ্রীক) :**

মেথি বীজ রক্তে খারাপ কোলেস্টেরল (এলডিএল) কমায় এবং ভালো কোলেস্টেরল (এইচডিএল) বাড়ায়।

ব্যবহার : প্রতিদিন মেথি ভেজানো জল খেলে হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস পায়।

- **হলুদ (টারমারিক) :**

হলুদের উপাদান প্রদাহ এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমায়।

ব্যবহার : হলুদ গুঁড়ো দুধের সঙ্গে মিশিয়ে পান করা যেতে পারে। এটি রক্ত প্রবাহ উন্নত করে।

• আমন্ড (আমন্ড) :

আমন্ডের ভিটামিন-ই এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হৃদরোগ প্রতিরোধে কার্যকর।

ব্যবহার : প্রতিদিন মুষ্টিমেয় আমন্ড খেলে হৃৎপিণ্ড সুস্থ থাকে।

• দারচিনি (সিনামোন) :

দারচিনির অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস করে।

ব্যবহার : খাদ্যে দারচিনি গুঁড়ো ব্যবহার করা বা চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে পান করা যেতে পারে।

• অলিভ অয়েল (অলিভ অয়েল) :

অলিভ অয়েল ভালো কোলেস্টেরল (এলডিএল) বাড়াতে এবং খারাপ কোলেস্টেরল (এইচডিএল) কমাতে সাহায্য করে।

ব্যবহার : রান্নায় বা সালাডে অলিভ অয়েল ব্যবহার করলে হৃদপিণ্ডের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে।

হৃদরোগ প্রতিরোধে ভেষজ চিকিৎসার প্রভাব

ভেষজ চিকিৎসার অনেক ইতিবাচক দিক রয়েছে—

• প্রাকৃতিক : ভেষজ চিকিৎসা রাসায়নিকমুক্ত

এবং প্রাকৃতিক, তাই এটি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন।

• খরচ সাশ্রয়ী : এটি আধুনিক চিকিৎসার তুলনায় অনেক সস্তা।

• সহজলভ্য : ভেষজ উপাদান সহজে উপলব্ধ।

ভেষজ চিকিৎসার সীমাবদ্ধতা

ভেষজ চিকিৎসা যতই উপকারী হোক না কেন, এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে—

• গবেষণার অভাব : অনেক ভেষজ উপাদানের কার্যকারিতা এখনও বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়নি।

• সঠিক ডোজের অভাব : সঠিক মাত্রা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে এটি ক্ষতিকর হতে পারে।

• গুরুতর অবস্থায় অপ্রতুল : ভেষজ চিকিৎসা গুরুতর হৃদরোগের ক্ষেত্রে নিশ্চিত সমাধান নয়।

হৃদরোগ প্রতিরোধে জীবনধারা পরিবর্তন

ভেষজ চিকিৎসার পাশাপাশি হৃদরোগ প্রতিরোধে সঠিক জীবনধারা গুরুত্বপূর্ণ—

- স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস গ্রহণ।
- ধূমপান এবং অ্যালকোহল ত্যাগ।
- নিয়মিত ব্যায়াম।
- মানসিক চাপ কমানো।

হৃদরোগ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসায় ভেষজ পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্জুন, রসুন, আদা, হলুদ, মেথি এবং তুলসির মতো ভেষজ উপাদান হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে এবং হৃৎপিণ্ডকে সুস্থ রাখতে কার্যকর। তবে গুরুতর অবস্থায় আধুনিক চিকিৎসার প্রয়োজন। ভেষজের সঠিক ব্যবহার এবং স্বাস্থ্যকর জীবনধারা হৃদরোগমুক্ত জীবনযাপনের চাবিকাঠি।

তবে, বিশেষত গুরুতর হৃদরোগের ক্ষেত্রে ভেষজ চিকিৎসা আধুনিক চিকিৎসার পরিপূরক হিসেবেই ব্যবহার করা উচিত। এবং স্বচিকিৎসা একেবারেই নিষিদ্ধ। ❑

সুস্বাস্থ্য-র দুই নবতম প্রকাশনা

ডাঃ সবুজ সেনগুপ্তের

মাতৃত্বে জটিলতা

গর্ভাবস্থায় জটিলতা মুক্তির আশ্বাস

ডাঃ সুগত মুখোপাধ্যায়ের

দাঁতের ঘরে রোগের বাসা

দাঁত পরিচর্যার A টু Z

শ্বাসকষ্টে খাওয়া–দাওয়ার ভূমিকা

কমলা আদক
(বিভাগীয় প্রধান, খাদ্য ও পুষ্টি বিভাগ,
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
মোবাইল : ৮৭৭৭০৮৮২৯৫, ৯৮৩০১৫১৪৭৬

শ্বাসকষ্ট হলে শ্বাস নিতে অসুবিধা হয়, বুকে চাপ পড়ে, অক্সিজেনের অভাব বলে মনে হয়। শ্বাসকষ্টের কারণে শ্বাস নেওয়ার সময় শব্দ হয় এবং কাশি হতে পারে।

শ্বাসকষ্টের কারণ

শ্বাসকষ্টের অনেক কারণ থাকতে পারে, কিছু গুরুতর নাও হতে পারে এবং নিজে থেকেই ভালো হয়ে যেতে পারে।

শ্বাসযন্ত্রের অবস্থা

ফুসফুসে বাধা বা সমস্যা শ্বাসকষ্টের কারণ হতে পারে—যেমন হাঁপানি, অ্যালার্জি, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিজ (সিওপিডি), নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, ফুসফুসে প্রদাহ বা তরল জমে যাওয়া, ব্রঙ্কাইটিস ইত্যাদি।

কার্ডিয়াক অবস্থা

হৃৎপিন্ডের সমস্যাগুলোও হঠাৎ বা বারবার শ্বাসকষ্টের কারণ হতে পারে যার মধ্যে রয়েছে অ্যারিদমিয়া, কার্ডিওমায়োপ্যাথি, হার্টের প্রদাহ।

অন্যান্য সম্ভাব্য কারণ

উদ্বেগ, বি.এম.আই ৩০–এর উপরে থাকা।

শ্বাসকষ্টের লক্ষণ

শ্বাসকষ্টের লক্ষণগুলো ব্যক্তি থেকে ব্যক্তিতে পরিবর্তিত হতে পারে, তাদের উপলব্ধি এবং এর কারণের অন্তর্নিহিত অবস্থার ওপর নির্ভর করে। কখনও কখনও শ্বাসকষ্টের সাথে অন্যান্য উপসর্গও থাকতে পারে।

ঘ্রাণ (শব্দে শ্বাস নেওয়া), বুক টান, দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস, উচ্চ হৃদস্পন্দনের হার, একটি গভীর শ্বাস পেতে কঠোর পরিশ্রম। কখনও কখনও বুকে ব্যথা এবং শ্বাসকষ্টের মতো অন্যান্য উপসর্গ থাকতে পারে, এই ধরনের লক্ষণগুলো উপেক্ষা করা উচিত নয়। অবিলম্বে চিকিৎসা করা উচিত।

শ্বাসকষ্টের নির্ণয়

শ্বাসকষ্টের অন্তর্নিহিত কারণ শনাক্তকরণের জন্য ডাক্তারি পরীক্ষার প্রয়োজন। যেমন—

- বুকের এক্স–রে, সিটি স্ক্যান, রক্তাল্পতা দেখতে রক্ত পরীক্ষা।
- লাঙ ফাংশন পরীক্ষা ইত্যাদি।

> **“ফুসফুসের যত্ন নেওয়া সহজ নয়। অত্যধিক বায়ুদূষণ, নিয়মিত ধূমপানের অভ্যাস এবং আরও বেশ কিছু কারণে ফুসফুসের নানা সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে। শুধু বয়স বাড়লে নয়, কম বয়সীদের মধ্যেও শ্বাসকষ্ট, হাঁপানির সমস্যা দেখা দিচ্ছে।”**

শ্বাসকষ্টের চিকিৎসা

অল্প কিছুক্ষণের জন্য শ্বাসকষ্ট হলে চিকিৎসার প্রয়োজন নাও হতে পারে। তবে দরকার পড়লে ওষুধ খেতে হবে, ইনহেলার ব্যবহার করতে হবে।

ফুসফুসের যত্ন নেওয়া সহজ নয়। অত্যধিক বায়ুদূষণ, নিয়মিত ধূমপানের অভ্যাস এবং আরও বেশ কিছু কারণে ফুসফুসের নানা সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে। শুধু বয়স বাড়লে নয়, কম বয়সীদের মধ্যেও শ্বাসকষ্ট, হাঁপানির সমস্যা দেখা দিচ্ছে। ফুসফুস ভালো রাখতে হলে বেশ কিছু নিয়ম মেনে চলার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিৎসকেরা। তার মধ্যে অন্যতম হল স্বাস্থ্যকর কিছু খাবার এবং পানীয় নিয়মিত খাওয়া। কিছু শারীরিক ব্যায়ামেরও প্রয়োজন। যেগুলো আবার ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করে।

■ **লেবুজল**

সকালে উঠে ঈষদুষ্ণ জলে লেবুর রস মিশিয়ে খেলে ফুসফুস ভালো থাকে। সংক্রমণের ঝুঁকি কমায়।

■ **ওটস এবং বেরি**

ব্লুবেরি বা স্ট্রবেরি মিশিয়ে ওটস খেলে শ্বাসকষ্টের সমস্যা কমে। বেরিজাতীয় ফলে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যা ফুসফুসের সংক্রমণ দূর করে।

■ **টোফু**

প্রোটিন ও ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ টোফু ফুসফুসের যত্ন নেয়। শ্বাসকষ্টের সাধারণ সমস্যা থাকলে অচিরেই তা নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।

■ **ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ খাবার**

গাজর, মিষ্টি আলু, সবুজ শাকসবজি, ব্রকোলিতে অনেকটা পরিমাণে ভিটামিন-এ আছে। এই ভিটামিন পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকলে ফুসফুস ঠিকমতো কাজ করতে পারে।

■ **কলা**

কলায় এমন কিছু অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আছে যা লাং ফাংশন বৃদ্ধি করে। ফলে শ্বাস নিতে সুবিধে হবে।

■ **ম্যাগনেসিয়াম যুক্ত খাবার থাকুক পাতে**

পালংশাক, কুমড়োবীজ, ডার্ক চকোলেট, স্যালমন মাছ ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ। ম্যাগনেসিয়ামের অভাবে ফুসফুস ঠিকমতো কাজ করে না।

■ **ফল ও শাকসবজি**

আছে অ্যান্টি অক্সিডেন্টসমূহ, ভিটামিন, ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে ভিটামিন সি থাকার জন্য। এই অ্যান্টি অক্সিডেন্ট শ্বাসযন্ত্রের কোষকে প্রদাহজনক ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। নিয়মিত সাইট্রাস খাওয়া ফুসফুসের কার্যকারিতা বাড়াতে পারে।

পাতাযুক্ত সবুজ শাক, বাঁধাকপি, লেটুস— বিটা ক্যারোটিন, লিউটেন, কোয়ারসিটিন অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ। এই যৌগগুলো ফুসফুসে প্রদাহজনক পথগুলোকে ব্লক করে। এগুলোর মধ্যে ভিটামিন-ই, ম্যাগনেসিয়াম ও ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডও থাকে।

■ **বাদাম ও বীজ**

বাদাম এবং বীজ হাঁপানির ডায়েটে পুষ্টিকর

“হাঁপানি নিরাময়ের অন্যতম প্রাচীন টোটকা হল মধু। বিশেষজ্ঞদের মতে রোজ রাতে ঘুমোবার আগে এক চামচ মধুর সাথে দারচিনি গুঁড়ো মিশিয়ে খেলে শ্বাসকষ্ট কমে যায়। সর্দি-কাশিতেও অনেক আরাম পাওয়া যায়।”

সংযোজন কারণ এতে স্বাস্থ্যকর চর্বি এবং ভিটামিন-ই থাকে। ভিটামিন-ই ফুসফুসের টিস্যুকে ফ্রি-র‍্যাডিক্যাল জনিত ক্ষতি এবং সেলুলার মিউটেশন থেকে রক্ষা করে।

সূর্যমুখী বীজ এবং কুমড়ো বীজ ভিটামিন-ই প্রদান করে, সাথে আছে ম্যাগনেসিয়াম, জিঙ্ক ও সেলেনিয়াম।

■ **চর্বিযুক্ত মাছ**

স্যামন, ম্যাকেরেল, টুনা এবং ট্রাউটের মতো চর্বিযুক্ত মাছ হাঁপানির লক্ষণগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য অসাধারণ খাবার। এতে আছে ইপিএ এবং ডিএইচএ নামক প্রদাহরোধী ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড।

■ **গোটা শস্য**

ফাইবার, ভিটামিন-ই, ভিটামিন-বি, ম্যাগনেসিয়াম ও স্বাস্থ্যকর চর্বি সমৃদ্ধ ব্রাউন রাইস, পুরো গমের রুটি ইত্যাদি গোটা শস্য অক্সিডেটিভ স্ট্রেস এবং শ্বাসনালীর ক্ষতি কমায়।

■ **মটরশুঁটি**

পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং জিঙ্ক সমৃদ্ধ চর্বিহীন প্রোটিনটি ফুসফুসের কার্যকারিতা সহজতর করে। এর অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ও ফাইবার প্রদাহ কমায়।

■ **দই**

প্রোবায়োটিক সমৃদ্ধ খাবারটি অন্ত্রে স্বাস্থ্যকর ব্যক্টিরিয়াকে রক্ষা করে।

■ **গ্রিন টি**

এতে এপিগালোকাটেচিন গ্যালেট (ইজিসিজি) -এর মতো ক্যাটেচিন আছে, যার শরীরে শক্তিশালী অ্যান্টিইনফ্ল্যামেটরি এবং ইমিউন নিয়ন্ত্রণকারী প্রভাব রয়েছে। এবং ফুসফুসের টিস্যুকে অক্সিডেটিভ ক্ষতি থেকে রক্ষা করে। তবে দিনে আধ কাপের বেশি খাওয়া উচিত নয়।

■ **মধু**

হাঁপানি নিরাময়ের অন্যতম প্রাচীন টোটকা হল মধু। বিশেষজ্ঞদের মতে রোজ রাতে ঘুমোবার আগে এক চামচ মধুর সাথে দারচিনি গুঁড়ো মিশিয়ে খেলে শ্বাসকষ্ট কমে যায়। সর্দি-কাশিতেও অনেক আরাম পাওয়া যায়।

■ **আদা**

জলের মধ্যে আদা ফেলে ফুটিয়ে সেই মিশ্রণ খেলে শুধু হাঁপানি নয়, জ্বর, সর্দিকাশিতেও উপকার মেলে।

■ **রসুন**

এককাপ দুধের মধ্যে তিন-চার কোয়া রসুন

ফুটিয়ে খেলে ফুসফসের জন্য খুবই উপকারি।

■ **হলুদ**

হলুদে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কারকিউমিন রয়েছে যা প্রদাহের সাথে জড়িত জিনগুলোর সক্রিয়করণকে বন্ধ করে।

■ **পেঁয়াজ**

পেঁয়াজ যে কোনো প্রদাহজনিত রোগ উপশমে খুবই উপকারি। এছাড়া নাসাপথকে পরিস্কার রাখতে সাহায্য করে। কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়া আরও ভালো।

শ্বাসকষ্ট এড়াতে কয়েকটি খাবার–দাবার

প্রক্রিয়াজাত এবং ভাজা খাবার ঃ

প্রক্রিয়াজাত খাবারে প্রায়শই প্রদাহজনক চর্বি বেশি থাকে এবং পুষ্টির অভাব হয়, যার ফলে শ্বাসকষ্টের জন্য সবচেয়ে খারাপ খাবার হয়ে ওঠে। এগুলো হল আলুর চিপস, দোকানের বেকড পণ্য, প্রক্রিয়াজাত মাংস বা মাইক্রোওয়েভ খাবার। ফেঞ্চ ফ্রাই এবং ডোনাটের মতো স্টার্চি ভাজা খাবার বিরক্তিকর অ্যাক্রিলামাইড যৌগ তৈরি করে। তাই শ্বাসকষ্ট এড়ানোর জন্য প্রক্রিয়াজাত এবং ভাজা আইটেম খাওয়া সীমিত করা উচিত।

চিনিযুক্ত খাবার এবং পানীয় ঃ

অতিরিক্ত চিনি সিস্টেম জুড়ে প্রদাহ সৃষ্টি করে এবং ইমিউন ফাংশনকে দমন করে। যেমন মিছরি, বেকড পণ্য, মিষ্টি পানীয়, ডেজার্ট ইত্যাদি।

■ **অ্যালকোহল**

অ্যালকোহল শ্বাসকষ্ট ও কাশিকে বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই অ্যালকোহল পরিমিত পরিমাণে পান করা উচিত, পারলে না করাই উচিত।

■ **ফাস্ট ফুড**

ফাস্টফুড প্রদাহজনক স্যাচুরেটেড ফ্যাট, সোডিয়াম এবং রাসায়নিক সংরক্ষণকারীতে বেশি থাকে—যেগুলো হল বার্গার, কার্বনেটেড পানীয়, পিৎজা, মুরগির রোস্ট। ফাস্টফুড খাওয়া কমিয়ে শ্বাসকষ্টের উপশম করা যাবে।

■ **দুধ**

পনির, দই ও অন্যান্য দুগ্ধজাত দ্রব্য শ্বাসকষ্টের ট্রিগার। তাই এই খাবার সীমিত করা উচিত। দুধে থাকা প্রোটিন হাঁপানির সমস্যা বাড়াতে পারে।

“প্রক্রিয়াজাত খাবারে প্রায়শই প্রদাহজনক চর্বি বেশি থাকে এবং পুষ্টির অভাব হয়, যার ফলে শ্বাসকষ্টের জন্য সবচেয়ে খারাপ খাবার হয়ে ওঠে। এগুলো হল আলুর চিপস, দোকানের বেকড পণ্য, প্রক্রিয়াজাত মাংস বা মাইক্রোওয়েভ খাবার। ফেঞ্চ ফ্রাই এবং ডোনাটের মতো স্টার্চি ভাজা খাবার বিরক্তিকর অ্যাক্রিলামাইড যৌগ তৈরি করে। তাই শ্বাসকষ্ট এড়ানোর জন্য প্রক্রিয়াজাত এবং ভাজা আইটেম খাওয়া সীমিত করা উচিত।”

■ **ক্যাফিন**

কফি, চা, সোডা, এনার্জি ড্রিঙ্কস এবং চকোলেটে পাওয়া ক্যাফিন যা শ্বাসনালীকে অতিরিক্ত উত্তেজিত করতে পারে।

■ **খাদ্য অ্যালার্জেন**

সাধারণ খাবারের অ্যালার্জেনগুলো সংবেদনশীল ব্যক্তিদের অনাক্রম্য প্রক্রিয়াগুলোকে ট্রিগার করে শ্বাসকষ্টের উদ্রেক করতে পারে। যার মধ্যে রয়েছে গম, ডিম, চিনাবাদাম ইত্যাদি। অ্যালার্জি পরীক্ষা করে নির্দিষ্ট অ্যালার্জেন এড়াতে পারলে তা শ্বাসকষ্টের সমস্যা প্রতিরোধে সাহায্য করতে পারে।

■ **সালফাইটযুক্ত খাবার**

শুকনো ফল, মদ, বোতলজাত লেবুর রস, চিংড়িতে প্রিজারভেটিভ হিসেবে ব্যবহৃত সালফাইটগুলো শ্বাসকষ্টের উপসর্গ সৃষ্টি করতে পারে।

■ **ঠান্ডা খাবার, পানীয়**

আইসক্রিম, কোল্ডড্রিঙ্কস এবং অন্যান্য ঠান্ডা খাবার ব্রঙ্কিয়াল খিঁচুনি বাড়াতে পারে।

উপযুক্ত খাদ্যতালিকা শ্বাসকষ্ট নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধকে উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রভাবিত করে। অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটারি যৌগ সমৃদ্ধ সবুজ শাকসবজি, তাজা খাবার দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ভারী প্রক্রিয়াজাত খাবার, সাধারণ অ্যালার্জেন এবং বিরক্তিকর উপাদান এড়িয়ে চলতে হবে। সর্বোত্তম খাদ্য পরিকল্পনা নির্ধারণ করতে ডাক্তার বা পুষ্টিবিদদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। ❑

মন ভালো রাখতে চাই ফুচকা

প্রফেসর কৃষ্ণজ্যোতি গোস্বামী
মোবাইল : ৯৮৩১১৩৪৯০৮

‘ফুচকা’ এই নামটি শুনলেই তো ছোট বা বড় সবারই জিভে জল চলে আসে। চোখের সামনে ফুচকা দেখলে কেউ আর লোভ সামলাতে পারে না, সব বয়সের মানুষেরই পছন্দ। এটি খেলে মন-প্রাণ ভরে যায়। এই স্বাদে মজে থাকেন আট থেকে আশি সকলেই। কুড়কুড়ে-মুচমুচে গোলাকৃতি এক পাপড়ির ভেতর আলু-ছোলা সহযোগে মশলাদার ঝাল চটপটি। আর তার ওপর টক-মিষ্টি-গন্ধরাজ লেবুর সুবাসে টক-মিষ্টি তেঁতুল জল। আস্ত একটা ফুচকা মুখে পুরে নিয়ে কামড় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে যায়। এই স্বাদের তুলনা কি অন্য কিছুর সঙ্গে হয়? না, একদমই হয় না। স্কুল ছুটির পর, অফিস ফেরত, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষাতে, উৎসবে-পার্বণে, এমনকী বিয়েবাড়ি বা অনুষ্ঠান বাড়িতেও ফুচকা চাই-ই-চাই। এই মুখরোচক খাবারটি প্রায় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবারই প্রিয়। সব মানুষকেই কাছে টানে ফুচকা, তাই আমাদের আশেপাশে খুব কম মানুষই পাওয়া যাবে, যারা ফুচকা খেতে ভালোবাসেন না।

ফুচকা পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা ভারতেই জনপ্রিয় এক পথ-চলতি খাবার। ফুচকাকে ডাকা হয় নানা নামে। ফুচকার সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রচলিত নাম হল ‘পানিপুরি’। এর উদ্ভব হয়েছিল দক্ষিণ বিহারে। পানিপুরি বলার কারণ ফোলা মুচমুচে পুরির ভেতর টক-ঝাল-মিষ্টি জল দিয়ে তৈরি হওয়ার কারণে।

“ফুচকা পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা ভারতেই জনপ্রিয় এক পথ-চলতি খাবার। ফুচকাকে ডাকা হয় নানা নামে। ফুচকার সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রচলিত নাম হল ‘পানিপুরি’। এর উদ্ভব হয়েছিল দক্ষিণ বিহারে। পানিপুরি বলার কারণ ফোলা মুচমুচে পুরির ভেতর টক-ঝাল-মিষ্টি জল দিয়ে তৈরি হওয়ার কারণে।”

অনেকে এই খাবারের উৎপত্তিস্থল হিসেবে বারাণসীকে চিহ্নিত করেন। তবে, এটি প্রথম দিকে ‘পুলকি’ নামে পরিচিত ছিল। তবে পরবর্তীকালে নামকরণ হয় ‘গোলগাপ্পা’। কারণ, গোল একটা ফুচকাকে একেবারে মুখ পুরে দেওয়ার কারণে।

প্রথমে লুচির ক্ষুদ্র সংস্করণকে কুড়কুড়ে করে খাওয়ার প্রচলন শুরু হয়েছিল। পরে মোগলাই খাবারের সংস্পর্শে এসে এর চেহারার পরিবর্তন আসে। সাধারণ শক্ত লুচি পরিণত হয় এক মশলাদার রসালো গোলাগাপ্পা বা পানিপুরিতে, যা এখন ফুচকা নামে বহুল পরিচিত। এছাড়া এর পরিচিতি টিক্কি, পানিকে বাতাসে, গুপচুপ, বাতাসি, পকোড়া ও পকোরি-তে। ফুচকাকে দক্ষিণ এশীয় খাবার হিসেবে ধরা হয়। তবে,

ফুচকাকে 'কমপ্লিট স্ট্রিট ফুড' বলা হয়।

নামকরণের ভিন্নতার পাশাপাশি এর পরিবেশনের পদ্ধতিতে ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। তবে, মূল পার্থক্য হল এর পুর তৈরিতে। যেমন আলুর পুর, সবজির পুর, স্যালাডের পুর, ঘুগনির পুর। কোনো কোনো জায়গায় ঝালের পরিবর্তে মিষ্টি জাতীয় পুর ব্যবহার করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে, তেঁতুল জলের পরিবর্তে দেখা যায় ধনেপাতার চাটনি, পুদিনা মিশ্রিত জল, লেবুর জল বা মিষ্টি খেজুর জল। আজকাল দেশজুড়ে দই-ফুচকা বা টকদই সহযোগে পরিবেশিত ফুচকা বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এতে নানারকম ছোলা-মটর, চানাচুর, মিষ্টি, পাঁপড়ের সঙ্গে দেওয়া হয় বাদামকুচি। ওপরে তেঁতুল জলের বদলে থাকে টক-দই।

আসলে ফুচকার স্বাদ খুব দ্রুত মুখের স্বাদ-গ্রন্থিগুলোকে উজ্জীবিত করে। এ কারণে মন খারাপ থাকলে তা সহজেই ভালো হয়ে যায়। তাই মন খারাপ থাকলে ফুচকা কিন্তু অনেক ভালো একটা সমাধান হতে পারে। অনেকটা এক ঢিলে দুই পাখি মারার মতো। একদিক দিয়ে যেমন পেট ভরল, তেমনি মনটাও ভালো হয়ে যায়।

তবে, অনেকে ফুচকা খেতে ভালোবাসলেও প্রাণভরে খেতে পারেন না। ফুচকা খাওয়া শরীরের পক্ষে ভালো নাকি খারাপ? এ প্রশ্ন অনেকেরই। ফুচকা খেলে শরীর থেকে উধাও হয়ে যাবে একাধিক রোগ তাই শরীর ও মন ভালো রাখতে দু'-একদিন ফুচকা খাওয়া যেতেই পারে।

হজমের গোলমাল বা ঘন ঘন অম্বলের আশঙ্কা থাকলে আপনার সহায়ক হতে পারে ফুচকার টক জল। কারণ এতে তেঁতুল জল ছাড়াও রয়েছে ধনেপাতা, বিটনুন, ধনিয়ার গুঁড়ো, লঙ্কা আর লেবু। তেঁতুল জলে রয়েছে প্রচুর অ্যান্টি অক্সিডেন্ট। এই জল খেলে হজমশক্তি বাড়বেই।

ফুচকায় পুদিনা পাতা ও ধনেপাতা ব্যবহার করা হয়। এই দুই ধরনের পাতাই অম্লের সমস্যা দূর করে, পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাও বাড়ায়। এই কারণে ঘন ঘন সর্দি-কাশি-জ্বর বা ব্যাক্টেরিয়াজনিত সংক্রমণের হাত থেকে নিস্তার পেতে বেছে নিতে পারেন ফুচকা-ই। ফুচকার জলে যে তেঁতুল ব্যবহার করা হয়, তাতে এমন উপাদান রয়েছে যা ব্যাক্টেরিয়াকে প্রতিহত করতে পারে। ফলে সংক্রমণ কম হয়। ফুচকায় ব্যবহার করা বিটনুন শুধু খাবারের স্বাদ বাড়ায় তাই নয়, এতে থাকে অ্যান্টি-ইনফ্লামেটরি যৌগ যা পেট ফোলা, পেট ব্যথা কমাতে সাহায্য করে।

আপনার স্থূলতা হ্রাস করতে সাহায্য করতে পারে কিন্তু ফুচকাই। ফুচকার জলে থাকা লেবু ও তেঁতুল শরীরে অতিরিক্ত মেদ ঝরাতেই সাহায্য করে।

তবে ফুচকার জলে প্রচুর পরিমাণে নুন ব্যবহার হয়। তাই এটি অতিরিক্ত খেলে রক্তচাপ বাড়তে পারে। এছাড়া বেশি পরিমাণে ফুচকা খেলে পেটে ব্যথা, ক্ষুধামান্দ, ডায়রিয়া হতে পারে। যাদের ইমিউনিটি কম, তাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত খাওয়ার পরিমাণে।

"হজমের গোলমাল বা ঘন ঘন অম্বলের আশঙ্কা থাকলে আপনার সহায়ক হতে পারে ফুচকার টক জল। কারণ এতে তেঁতুল জল ছাড়াও রয়েছে ধনেপাতা, বিটনুন, ধনিয়ার গুঁড়ো, লঙ্কা আর লেবু। তেঁতুল জলে রয়েছে প্রচুর অ্যান্টি অক্সিডেন্ট। এই জল খেলে হজমশক্তি বাড়বেই।"

আর অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ও শুদ্ধ জল ব্যবহার না হলে সালমোনেলা ও সিগেলার মতো ব্যাক্টেরিয়া সংক্রমণ হতে পারে।

কোনো জিনিসই বেশি খাওয়া ভালো নয়। তাই ফুচকাও বেশি খাবেন না। গুণে গুণে দেখেশুনে খান। আর যদি বাইরের বানানো ফুচকা খেতে ইতস্তত হয় তাহলে বাড়িতেই বানিয়ে ফুচকা খান, সমান উপকার হবে। সুস্থও থাকবেন। ❑

যৌনতা
যৌনসমস্যা ও
প্রতিকার নিয়ে

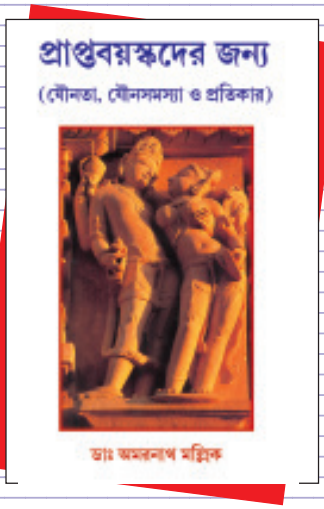

ডাঃ অমরনাথ
মল্লিকের
এক ব্যতিক্রমী বই

১০০ টাকা

সুস্বাস্থ্য প্রকাশনী

> “স্পিরুলিনা রক্ত পরিশোধনে এবং উচ্চ রক্তচাপ কমাতে দারুণভাবে কার্যকরী। এমনকী এটা রক্তে সুগারের পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে। প্রোটিন সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করে।”

সুপারফুড স্পিরুলিনা

সৌমেন্দ্র নাথ দাস

স্পিরুলিনা হল এক ধরনের খাদ্য উপযোগী নীল সবুজ শৈবাল গোত্রীয় উদ্ভিদ। দুই ধরনের শৈবাল রয়েছে যেগুলি খাবারের জন্য ব্যবহার করা হয়। স্পিরুলিনা ম্যাক্সিমা এবং স্পিরুলিনা প্লাটেনসিস। উচ্চ পুষ্টিগুণ সম্পন্ন এই স্পিরুলিনা বহু বছর ধরে মেক্সিকো এবং আফ্রিকার মতো দেশের লোকদের খাবারের উৎস ছিল। সমুদ্রের নোনা জলে এবং মিষ্টি জলে এই স্পিরুলিনা জন্মাতে দেখা যায় । স্পিরুলিনা কথাটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ স্পাইরাল থেকে । এই শৈবাল উদ্ভিদের দেহে বসবাস করে এক ধরনের সায়ানো ব্যাক্টেরিয়া।

সারা পৃথিবীব্যাপী এখন এই খাদ্য উপযোগীরা শৈবাল চাষ করা হচ্ছে। কারণ মানুষ এর পুষ্টিগুণ ও উপকার সম্পর্কে বুঝতে পেরেছেন । বিশ্বে এর সর্বাধিক চাহিদা রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে। ভারতবর্ষে এখন প্রতিবছর প্রায় ২০০ থেকে ৫০০ মেট্রিক টনের মতো কাঁচা স্পিরুলিনা উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে যা কিনা প্রতিবেশী দেশ চীনের তুলনায় অনেকটাই কম। ইতিমধ্যে নাসার মহাকাশচারীরা এটির ব্যবহার শুরু করে দিয়েছেন । ভারতবর্ষের অনেক কোম্পানি এর উৎপাদন শুরু করেছে। এটি ট্যাবলেট, ক্যাপসুল ও পাউডার হিসেবেও প্রস্তুত করা হচ্ছে।

স্পিরুলিনা নিরামিষাশীদের জন্য দুর্দান্ত খাবার। কারণ এর মধ্যে ৬০–৭০ শতাংশ প্রোটিন রয়েছে যা অন্য সব খাবারের তুলনায় অনেকটাই বেশি। আবার এর মধ্যে ফ্যাট বা চর্বি রয়েছে অনেক কম । টাটকা চাষ হওয়া স্পিরুলিনার প্রতি ১০০ গ্রামের মধ্যে রয়েছে ২.৫ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ৫.৯ গ্রাম প্রোটিন, ০.৪ গ্রাম ফ্যাট, ০.৪ গ্রাম ফাইবার, ৫৩০০ মিলিগ্রাম ভিটামিন–এ, ০.০৩ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি–৬, ০.৪৯ মিলিগ্রাম ভিটামিন– ই, ০.৩৪ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি–২, ৯ মাইক্রোগ্রাম ফোলেট, ২.৮ মিলিগ্রাম লোহা, ১২৭ মিলিগ্রাম পটাশিয়াম, ১১ মিলিগ্রাম ফসফরাস, ১২ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ৪০ মিলিগ্রাম ক্লোরোফিল এবং ৫৬০ মিলিগ্রাম ফাইকো সায়ানিন। এছাড়াও এর মধ্যে মজুদ রয়েছে বিটাক্যারোটিন ও জিয়াক্সজ্যানথিনের মতো উপাদানগুলি ।

পৃথিবীর মধ্যে চীন সর্বাধিক পরিমাণ স্পিরুলিনা উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে । চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে ভারতবর্ষে নানান কোম্পানি বাণিজ্যিকভাবে স্পিরুলিনা উৎপাদন শুরু করেছে। তার মধ্যে তামিলনাড়ু রাজ্যে অবস্থিত ই.আই.ডি প্যারি লিমিটেড সর্বাধিক পরিমাণ স্পিরুলিনা উৎপাদন করে । ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রাইভেট ফার্ম ও কোম্পানি এর চাষ সম্প্রীতি শুরু করেছে। পন্ডিচেরির স্পিরুলিনা ফার্ম ২০০৮ সালে উৎপাদন শুরু করেছে। হিমালয়ান অর্গানিক এর জৈব উৎপাদন চাষ শুরু করেছে । বর্তমানে ভারতবর্ষ ফ্রান্স, আমেরিকা এবং নেদারল্যান্ডের মতো দেশগুলিতে স্পিরুলিনা রপ্তানি করছে।

স্পিরুলিনা শৈবালের সন্তোষজনক বৃদ্ধির

জন্য জলের পি.এইচ মান হতে হবে ৮.৫। উদ্ভিদটি নিজের খাবার সালোকসংশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে নিজেই তৈরি করতে সক্ষম। ৩০–৩৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা হল এর জন্য আদর্শ। এর বৃদ্ধির জন্য আলোর ও আবহাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দেখা গেছে লাল, সাদা এবং সবুজ আলোকে এর দেহের মধ্যে সর্বাধিক পরিমাণ প্রোটিন তৈরি হয়। সারা বছর সূর্যের আলোর এই চাষের জন্য প্রয়োজন।

অত্যন্ত পুষ্টিকর এই খাবারের মধ্যে নানান ধরনের গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য উপাদান মজুদ থাকার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা ও অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা ঠেকানোর জন্য ভীষণ কার্যকরী হয়। দীর্ঘমেয়াদী ডায়েটরি সাপোর্টে জন্য স্পিরুলিনা ভীষণ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। গর্ভবতী মহিলাদের দেহে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহে এটি বেশ কার্যকরী। পুষ্টিগুণ সাপেক্ষে স্পিরুলিনার নানান ভেষজ গুণাবলী রয়েছে। এটি দেহের কোলেস্টলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। স্পিরুলিনা রক্ত পরিশোধনে এবং উচ্চ রক্তচাপ কমাতে দারুণভাবে কার্যকরী। এমনকী এটা রক্তে সুগারের পরিমাণ কমাতে সাহায্য করে। প্রোটিন সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করে। অ্যানিমিয়া বা রক্তস্বল্পতা রোগ নিরাময়ে ভীষণ কার্যকরী। হজমশক্তি বাড়াতে ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সাহায্য করে। পেশিশক্তি ও সহন ক্ষমতা বাড়াতে এবং দুশ্চিন্তা দূর করতে স্পিরুলিনা ভীষণভাবে সাহায্য করে।

উদ্যোগী কৃষক এবং বাণিজ্যিক খামারগুলি বড় মাপের জলের ট্যাংক ও পুকুরের মতো পরিস্কার জলাশয়ে স্পিরুলিনা চাষ করছে। উষ্ণমন্ডলীয় এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এর চাষ করা হয়ে থাকে। বাড়ির খোলা ছাদে, সিমেন্টের পাকা ট্যাংকেও এর চাষ হতে পারে।

সবচেয়ে সহজতম উপায় হল এর চা তৈরি করে খাওয়া। এছাড়াও উষ্ণ জলে এর পাউডার মিশিয়ে গুলিয়েও খেতে পারেন। ফলের রসের সাথে মিশিয়েও একে খাওয়া যেতে পারে । এক চামচ পরিমাণ (৫গ্রাম) স্পিরুলিনা এক গ্লাস জলে মিশিয়ে খাবেন । ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ্ হেলথ-এর নির্দেশ অনুসারে একজন পূর্ণবয়স্ক লোক সর্বাধিক দুই মাসের জন্য প্রতিদিন ১৯ গ্রাম পর্যন্ত এবং সর্বাধিক ৬ মাসের জন্য প্রতিদিন ১০ গ্রাম পর্যন্ত স্পিরুলিনা পাউডার খেতে পারেন। ❑

আমরা অনেকেই ভাবি, আমি যদি আরেকটু সুন্দর হতাম বা আমার যদি ওর মতো যোগ্যতা থাকত— এই চিন্তা আপনাকে আরও অসন্তুষ্ট করে। নিজের শক্তি আর দুর্বলতাগুলোকে বরং মেনে নিন। আপনি যেমন, সেটাই আপনার সবচেয়ে বড় পরিচয়।

কখনো কি ভেবেছেন
নিজেকে ভালোবাসবেন

এস. রায়

সবাই বলে, 'নিজেকে ভালোবাসুন', কিন্তু সেই ভালোবাসার মানে কী? সেটা কি আমরা জানি? নিজেকে ভালোবাসা মানে নিজেকে গ্রহণ করা— ঠিক যেমন আছেন সেভাবেই। আমাদের অনেকের ধারণা, নিজেকে ভালোবাসা মানে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাওয়া। কিন্তু আসল বিষয়টা একেবারেই ভিন্ন। নিজেকে ভালোবাসা মানে নিজের ভুলগুলো মেনে নেওয়া, নিজের প্রতি যত্নশীল হওয়া, আর নিজের সুখের জন্য নিজে উদ্যোগ নেওয়া। যে নিজেকে ভালোবাসতে পারে, সে-ই অন্যকে ভালোবাসার যোগ্য হয়। কারণ নিজের ভেতরে শান্তি না থাকলে, বাইরে সেটা ছড়ানো অসম্ভব।

■ **তাহলে নিজেকে ভালোবাসার উপায় কী?**

● **নিজের রিয়েলিটি মেনে নেওয়া :** আমরা অনেকেই ভাবি, আমি যদি আরেকটু সুন্দর হতাম বা আমার যদি ওর মতো যোগ্যতা থাকত— এই চিন্তা আপনাকে আরও অসন্তুষ্ট করে। নিজের শক্তি আর দুর্বলতাগুলোকে বরং মেনে নিন। আপনি যেমন, সেটাই আপনার সবচেয়ে বড় পরিচয়।

● **নিজের প্রতি সদয় হোন :** জীবনে অনেক সময় আমরা একটু বেশিই আত্মসমালোচনা করে ফেলি। নিজের ব্যর্থতা বা ভুলের জন্য নিজেকে শাস্তি দেওয়া বন্ধ করুন। মনে রাখবেন, মানুষ মাত্রই ভুল করে।

● **নিজের জন্য সময় দিন :** প্রতিদিন অন্তত কয়েকটা মুহূর্ত নিজের জন্য রাখুন। যেটা আপনার ভালো লাগে, সেটা করুন—হাঁটুন, গান শুনুন, বই পড়ুন। নিজের সঙ্গে সময় কাটানো মানেই নিজেকে ভালোবাসা।

● **নিজেকে গুরুত্ব দিন :** সবসময় অন্যকে খুশি করতে গিয়ে নিজের ইচ্ছাকে অবহেলা করবেন না। যেটা আপনার জন্য ভালো, সেটা করার সাহস রাখুন।

● **নেতিবাচক মানুষ এড়িয়ে চলুন :** আপনার চারপাশে এমন মানুষ থাকতে পারে, যারা আপনাকে শুধু দোষারোপ করে বা খারাপ অনুভব করায়। এই ধরনের মানুষের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখুন।

● **নিজেকে ক্ষমা করে দিন :** পুরনো ভুল বা ব্যর্থতার জন্য নিজেকে দোষারোপ করবেন না। অতীতকে মেনে নিন, কিন্তু নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে দেবেন না।

● **নিজের বেস্ট ভার্সন তৈরিতে ফোকাস দিন :** সব মানুষের ভিতরই অপার সম্ভাবনা থাকে। আপনি কেমন মানুষ হলে সবাই আপনাকে দেখে গর্ব করতে পারবে—তেমন মানুষ হয়ে উঠুন। সেটা হতে যা যা করা উচিৎ সেটাই করুন।

নিজেকে ভালোবাসা মানে নিজের প্রতি আন্তরিক হওয়া। নিজেকে ভালোবাসতে শুরু করলে দেখবেন, জীবন অনেক সহজ আর আনন্দময় হয়ে উঠেছে।

মনে রাখবেন, পৃথিবীতে আপনিই আপনার সবচেয়ে বড় সঙ্গী। ❑

সুস্বাস্থ্যের রান্না

ভারতী কুন্ডু
মোবাইল : ৮৪২০৭৯৪২৪৫

চিকেন পোলাও

উপকরণ ঃ

চিঁড়ে ২৫০ গ্রাম, আলু ২টি ছোট ছোট করে কাটা, মটরশুঁটি ২৫০ গ্রাম, ফুলকপি ছোট একটি টুকরো করে কাটা, বাদাম ১০০ গ্রাম, কাঁচালঙ্কা ৪টি, কারিপাতা ১ মুঠো, তেল ও নুন প্রয়োজনমতো, চিনি হাফ চামচ, ফোড়নের জন্য তেজপাতা ২টি, একটি শুকনো লঙ্কা, ২টি ছোট এলাচ, ২টি লবঙ্গ, একটি ছোট দারচিনি, কাজু ১০ গ্রাম, কিসমিস ১০ গ্রাম।

প্রণালী ঃ

চিঁড়ে দু'বার জল দিয়ে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন। কড়াইতে সাদা তেল গরম করে গ্যাস কমিয়ে চিঁড়ে ভেজে তুলে নিন। আলু ও কপি ভেজে নিন। মটরশুঁটি ভাপিয়ে জল ঝরিয়ে রাখুন। দু'চামচ তেল দিয়ে তেজপাতা, গরমমশলা, লঙ্কা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে বাদাম দিয়ে ভাজা হলে কারিপাতা, চিঁড়ে দিয়ে নাড়াচাড়া করে আলু, কপি, মটরশুঁটি, কাঁচালঙ্কা দিয়ে নাড়াচাড়া করে কাজু ও কিসমিস দিয়ে নাড়াচাড়া করে ঘি দিন। কিছুটা নেড়ে নিয়ে নামিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখুন। গরম গরম পরিবেশন করুন। চিঁড়ে কড়াইতে দিয়ে নাড়বার সময় হাফ চামচ হলুদ দিন।

নিরামিষ ডিম

উপকরণ ঃ

পনির ৫০০ গ্রাম, ছোলার ডাল ২৫০ গ্রাম, কাঁচালঙ্কা ৫–৬টি, কাশ্মিরী লঙ্কাগুঁড়ো ১ চামচ, চিনি হাফ চামচ, নুন স্বাদমতো, কর্নফ্লাওয়ার প্রয়োজনমতো, সাদা তেল প্রয়োজনমতো।

প্রণালী ঃ

পনির গ্রেটার দিয়ে গ্রেট করে নিয়ে আধখানা ডিমের আকারে গড়ে নিন। ছোলার ডাল ভিজিয়ে রেখে, জল ঝরিয়ে বেটে নিন। কাঁচালঙ্কা বেটে নেবেন। ছোলার ডাল বাটা, কাঁচালঙ্কা বাটা, নুন, চিনি একসঙ্গে মিশিয়ে পুর তৈরি করে আধখানা ডিমের মধ্যে পুর দিয়ে দিন। একটি জায়গায় অল্প জলে কর্নফ্লাওয়ার, নুন, কাশ্মিরী লঙ্কাগুঁড়ো দিয়ে মিশিয়ে নিন। ছোলার ডাল, পনির, আধখানা ডিম, কর্নফ্লাওয়ারের মিশ্রণে ডুবিয়ে গরম তেলে লাল করে ভেজে নিন। গরম গরম পরিবেশন করুন।

মুর্গ ভর্তা

উপকরণ ঃ

চিকেন ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজ কুচনো ৩টি মাঝারি সাইজের, আদা বাটা ৩ চামচ, টম্যাটো ২৫০ গ্রাম, ক্যাপসিকাম ১০০ গ্রাম, গরম মশলা গুঁড়ো ১ চামচ, নুন স্বাদমতো।

প্রণালী ঃ

হাড় ছাড়া চিকেন জল দিয়ে ধুয়ে পরিস্কার করে আদা, নুন দিয়ে প্রেসারে সিদ্ধ করে নিন। সিদ্ধ হলে টুকরো টুকরো করে কেটে নিন। টম্যাটো লম্বা করে কেটে নিন। ক্যাপসিকাম চৌকো করে কেটে নিন। কড়াইতে চিকেন স্টক ঢেলে টম্যাটো, ক্যাপসিকাম, সিদ্ধ চিকেন টুকরো দিয়ে নাড়াচাড়া করে গরম মশলা দিয়ে দিন। নুন প্রয়োজন হলে দেবেন। এবার ঢাকা দিয়ে দিন। ৫–৭ মিনিট পর ঢাকা খুলে নাড়াচাড়া করে নামিয়ে দিন।

মানকচু চিংড়ি

উপকরণ ঃ

মানকচু ৫০০ গ্রাম, চিংড়ি ৪০০ গ্রাম, আদা বাটা ১ চামচ, জিরে বাটা ১ চামচ, ধনে বাটা ১ চামচ, কাঁচালঙ্কা বাটা হাফ চামচ, চিনি হাফ চামচ, সরষের তেল ২–৩ চামচ, নুন স্বাদমতো, ফোড়নের জন্য কালো জিরে ১ চামচ, তেজপাতা ২টি, ১টি শুকনো লঙ্কা, ধনেপাতা কুচনো ১ আঁটি।

প্রণালী ঃ

মানকচুর খোসা ভালো করে ছাড়িয়ে ডুমো ডুমো করে কেটে নুন জল দিয়ে সেদ্ধ করে, জল ঝরিয়ে চটকে নিন। চিংড়ির খোসা ছাড়িয়ে জল দিয়ে ভালো করে পরিস্কার করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নুন হলুদ মাখিয়ে কড়াইয়ে তেল গরম করে চিংড়িমাছ ভেজে তুলে নিন। ওই তেলের মধ্যে কালো জিরে, তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা দিয়ে ফোড়ন হয়ে গেলে মানকচু পেস্ট দিয়ে

নাড়াচাড়া করে আদা, জিরে, ধনে বাটা ও কাঁচালঙ্কা বাটা দিয়ে কষে নিন। কষতে কষতে চিংড়ি মাছ দিয়ে নাড়াচাড়া করে নুন ও চিনি দিয়ে নাড়াচাড়া করে ভালো করে কষে নিয়ে অল্প গরম জল দিয়ে ফুটতে দিন। মাখো মাখো হলে ধনেপাতা ছড়িয়ে নামিয়ে ঢাকা দিন। গরম ভাতে গরম গরম পরিবেশন করুন।

ডিম পাউরুটির পকোড়া

উপকরণ ঃ

ডিম ৬টি, ৬ পিস পাউরুটি, পেঁয়াজ মিহি করে কাটা আড়াই চামচ, রসুন কুচনো ১ চামচ, কাঁচালঙ্কা ৩টি, দুধ আধ কাপ, ধনেপাতা কুচনো ১ মুঠো, তেল প্রয়োজনমতো, নুন স্বাদমতো।

প্রণালী ঃ

ডিম ভেঙে একটি জায়গায় দুধ দিয়ে মিশিয়ে ফেটিয়ে নিন। পাউরুটি পিসগুলো দুধের মিশ্রণে ভিজিয়ে চটকে নিন। এবার এই মিশ্রণটির মধ্যে ১ চামচ তেল, স্বাদমতো নুন এবং পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচালঙ্কা কুচনো, ধনেপাতা কুচনো দিয়ে ফেটিয়ে নিন। ব্যাটার যদি শক্ত হয় একটু দুধ দিয়ে পাতলা করবেন, আর যদি পাতলা হয় তবে বেসন দিয়ে শক্ত করে নেবেন। কড়াইতে তেল গরম হলে এক চামচ করে ব্যাটার দিন, ভেজে নিন। গরম গরম পরিবেশন করুন, টম্যাটো সস দিয়ে।

পনির পাসিন্দা

উপকরণ ঃ

পনির ৩০০ গ্রাম, ধনেপাতা ১ আঁটি, আদা বাটা ১ চামচ, ৪টি কাঁচালঙ্কা, একটি পাতিলেবুর জুস, নুন প্রয়োজনমতো, গোলমরিচের গুঁড়ো। একটি জায়গায় ময়দা, কর্নফ্লাওয়ার, নুন, গোলমরিচের গুঁড়ো প্রয়োজনমতো, ১ চামচ লঙ্কাবাটা দিয়ে ব্যাটার তৈরি করে নিন। খুব পাতলা হবে না।

প্রণালী ঃ

পনির পাতলা বরফি করে পিস করে নিন। পনির বরফির গায়ে নুন, গোলমরিচের গুঁড়ো মাখিয়ে নিন। বরফির উপরে ধনেপাতা, আদা, নুন, কাঁচালঙ্কা, পাতিলেবুর রস দিয়ে একসঙ্গে পেস্ট করে নিয়ে মাখিয়ে নিন। তার উপরে আর একটি পনির বরফি ঢাকা দিয়ে, ব্যাটারে ডুবিয়ে কড়াইয়ের তেল গরম হলে দিয়ে দিন। গ্যাস মিডিয়ামে রেখে ভেজে নিন। টম্যাটো সস দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

পুর ভরা কাঁকরোল

উপকরণ ঃ

কাঁকরোল ৫টি, কুচো চিংড়ি ২৫০ গ্রাম, হলুদ হাফ চামচ, কাঁচালঙ্কা বাটা ১ চামচ, পোস্ত বাটা ২ চামচ, ময়দা ৩-৪ চামচ, নুন স্বাদমতো, মাখন ৩ চামচ, সাদা তেল প্রয়োজনমতো।

প্রণালী ঃ

কাঁকরোল পুরো কাটবেন না, অর্ধেকটা টুকরো করে নিন। কাঁকরোলের ভিতরের বীজগুলো ছুরি দিয়ে বা চামচের পেছন দিয়ে পরিষ্কার করে নিন। কড়াইতে জল দিয়ে আধ-সেদ্ধ করে নিন। জল ঝরিয়ে রাখুন। চিংড়ি খোসা ছাড়িয়ে জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নুন, হলুদ মাখিয়ে কড়াইয়ে তেল দিয়ে ভেজে তুলে নিন। পোস্তবাটা, কাঁচালঙ্কা বাটা ১ চামচ, নারকেল কোরা ৪ চামচ, নুন স্বাদমতো আর চিংড়িমাছ দিয়ে একত্রে সব মিশিয়ে পুর তৈরি করে নিন। এবার একটি জায়গায় ময়দা, বেসন এক কাপ, নুন, কাঁচালঙ্কা বাটা ১ চামচ, কালো জিরে হাফ চামচ, পোস্তদানা ১ চামচ, বেকিং সোডা চা-চামচের হাফ চামচ দিয়ে ঘন করে ব্যাটার তৈরি করে নিন। কাঁকরোলের মধ্যে পুর দিয়ে ব্যাটারে ডুবিয়ে কড়াইয়ে তেল গরম করে কাঁকরোলের দু'পিঠ ভালো করে ভেজে তুলে নিন। গরম গরম ভাতের সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন।

তেল ছাড়া মশলা মাছ

উপকরণ ঃ

রুইমাছ ৫০০ গ্রাম, পেঁয়াজবাটা ৪ চামচ, রসুন বাটা ১ চামট, আদাবাটা ১ চামচ, হলুদ গুঁড়ো হাফ চামচ, জিরে গুঁড়ো হাফ চামচ, দই ৩ চামচ, চিনি হাফ চামচ, নুন স্বাদমতো।

প্রণালী ঃ

মাছ ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখুন। একটি জায়গায় পেঁয়াজ বাটা, রসুন বাটা, আদা বাটা, হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, দই ও মাছ দিয়ে সব মশলা বাটা মাখিয়ে ৩০ মিনিট রাখুন। এবার কড়াইয়ে পরিমাণমতো জল দিন, গ্যাসে বসান, জল ফুটলে ম্যারিনেট করা মাছগুলো দিয়ে চাপা দিয়ে দিন। ৫-৭ মিনিট ফোটার পরে উল্টে ঢাকা দিন। পাঁচ মিনিট পর ঢাকা খুলে চিনি দিন, নাড়াচাড়া করে গরম মশলা ছড়িয়ে নামিয়ে ঢাকা দিন। গরম গরম পরিবেশন করুন।

মাংসের সিঙাড়া

উপকরণ ঃ

কিমা ৩০০ গ্রাম, আদা হাফ ইঞ্চি, পেঁয়াজ ২টি, রসুন ১ চা-চামচ, কাঁচালঙ্কা দেড় চামচ, জিরে গুঁড়ো হাফ চামচ, ধনে গুঁড়ো হাফ চামচ, নুন স্বাদমতো, ময়দা ৩০০ গ্রাম, সাদা তেল ভাজার জন্য।

প্রণালী ঃ

আদা, পেঁয়াজ, রসুন একসঙ্গে পেস্ট করে নিন। কড়াইতে তেল গরম করে পেঁয়াজ, আদা, রসুন বাটা দিয়ে নাড়াচাড়া করে জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো দিয়ে নাড়াচাড়া করে কিমা দিয়ে কষতে কষতে নুন দিন। নাড়তে নাড়তে অল্প গরম জল দিন। জল শুকিয়ে গেলে হাফ চা-চামচ গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে নাড়াচাড়া করে নামিয়ে নিন। ময়দায় হাফ চামচ নুন দিন। কালো জিরে হাফ চামচ দিন। সাদা তেল ২ চামচ দিয়ে জল দিয়ে ভালো করে মেখে নিয়ে লেচি কেটে লম্বা করে বেলে নিয়ে মাঝখান থেকে নিয়ে আধখানা টুকরো নিয়ে তিনকোণা করে মুড়ে মাংসের পুর দিয়ে খোলা মুখটা বন্ধ করে দিন। কড়াইয়ে তেল গরম হলে সিঙাড়া ভেজে তুলে নিন। গরম গরম পরিবেশন করুন।

মাংসের দইবড়া

উপকরণ ঃ

সেদ্ধ মটন ৫০০ গ্রাম, দই ৩ কাপ, ব্রেড ক্রম্বস ১০ চামচ, হলুদ গুঁড়ো ১ চামচ, কাঁচালঙ্কা বাটা ১ চামচ, ধনেপাতা কুচনো ১ মুঠো, পুদিনাপাতা কুচনো ১ চামচ, গরম মশলা গুঁড়ো ১ চামচ, মৌরি ভেজে থেঁতো করা হাফ চামচ, নুন স্বাদমতো, সাদা তেল প্রয়োজনমতো, আদাবাটা, গোরমরিচ গুঁড়ো হাফ চামচ, রসুন বাটা ১ চামচ।

প্রণালী ঃ

সেদ্ধ করা কিমা ও ব্রেড ক্রম্বস, হলুদ গুঁড়ো, কাঁচালঙ্কা বাটা, আদা বাটা, রসুনবাটা, গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে ধনেপাতা, পুদিনাপাতা দিয়ে নুন দিয়ে মেখে নিতে হবে। কাবাবের মতো গড়ে নিন। কড়াইয়ে তেল গরম হলে কাবাবগুলো তেলে দিয়ে দু'পিঠ ভালোভাবে ভেজে তুলে নিন। কাবাবগুলো প্লেটে রেখে, স্বাদমতো নুন দিয়ে দই ফেটিয়ে গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে কাবাবের ওপর দিয়ে দিন। মৌরিগুঁড়ো ছড়িয়ে পরিবেশন করুন। ❑

একটু স্বচ্ছল বাঙালি পরিবারগুলোর ছেলেমেয়েরা সরকারি বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয় বিমুখ হয়ে উঠেছে। এজন্য বহু বাঙালি ছাত্র–ছাত্রীরা বাংলা ভাষা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অনেক ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের সিলেবাসে বাংলা ভাষা অন্তর্ভুক্ত থাকলেও তা যথাযথ গুরুত্ব সহকারে পড়ানো হয় না। অনেকের ধারণা বাংলা মাধ্যমে পড়াশোনা করলে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না।

‘আ মরি বাংলা ভাষা’

ডাঃ অজয় কুমার ঘোষ

রবীন্দ্রনাথ—হেলেন কেলার

বাংলা ভাষা ধ্রুপদী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আমরা বাঙালিরা নিশ্চয়ই আনন্দে আহ্লাদিত হয়েছি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে আপামর জনগণের মধ্যে বাংলা ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে তেমন কোনো উন্নতির লক্ষণ চোখে পড়ছে না। এর অনেকগুলো কারণ আছে। বর্তমানে বাঙালীরা বাংলা সাহিত্য পাঠ ও চর্চা প্রায় ভুলেই গেছে। ছেলেবেলায় যেসব পাঠাগারগুলো পাঠকদের আনাগোনা ও পদচারণায় গমগম করত সেগুলো এখন প্রায় শুনশান, হতশ্রী অবস্থা। এখন অধিকাংশ বাঙালির খবরের কাগজের মুখরোচক সংবাদ পাঠের মধ্যেই বাংলা পড়া সীমাবদ্ধ। বর্তমান প্রজন্মের বহু বঙ্গ ছাত্র–ছাত্রী প্রায় বাধ্য হয়েই ইংরেজি ও হিন্দি ভাষাকে তাদের শিক্ষার মাধ্যম করে নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো ও মান ক্রমশ অবক্ষয়ের দিকে চলেছে। গ্রাম গঞ্জের বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক ও ছাত্রের অনুপাত হতাশা ব্যঞ্জক। ফলে একটু স্বচ্ছল বাঙালি পরিবারগুলোর ছেলেমেয়েরা সরকারি বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয় বিমুখ হয়ে উঠেছে। এজন্য বহু বাঙালি ছাত্র–ছাত্রীরা বাংলা ভাষা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অনেক ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের সিলেবাসে বাংলা ভাষা অন্তর্ভুক্ত থাকলেও তা যথাযথ গুরুত্ব সহকারে পড়ানো হয় না। অনেকের ধারণা বাংলা মাধ্যমে পড়াশোনা করলে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। যদিও আমি এ ব্যাপারে একমত নই। যদি তাই হতো তবে রামকৃষ্ণ মিশন থেকে বাংলা মাধ্যমে পাশ করা ছাত্ররা বিশ্বজুড়ে এমন দাপিয়ে বেড়াতে পারত না। স্রোতের বিপরীতে গিয়ে আমিও আমার পুত্রকে বাংলা মাধ্যমেই পড়িয়েছি। এতে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় নি। তবে এমন বিদ্যালয় নির্বাচন করতে হবে যেখানে শিক্ষা গ্রহণের সুস্থ পরিবেশ বজায় আছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে এইরকম বাংলা মাধ্যম স্কুলের সংখ্যা দ্রুত কমে আসছে। মোদ্দা কথা হল শিক্ষার পরিবেশ যদি ঠিকমতো বজায় থাকে, তবে বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে এবং উভয় ভাষাকে অবলম্বন করে শিক্ষার স্তরগুলো এক এক করে অতিক্রম করে তরতর করে উপরে ওঠা যায়। এ প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, আগে হোক মাতৃভাষার শক্ত গাঁথুনি তারপর বিদেশি ভাষার পত্তন। ইংরেজি মাধ্যমে পড়া বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীরা বাংলা ভাষা ঠিকমতো পড়তে বা লিখতে পারে না। এমনকী বাংলা উচ্চারণ করে অবাঙালীদের মতো করে। এ ব্যাপারে

অভিভাবকদের সচেষ্ট হতে হবে যাতে তাদের সন্তান-সন্ততিরা বাংলা পড়তে ও লিখতে পারে। বাংলা সাহিত্যের মধ্যে যে অমূল্য রতন সঞ্চিত আছে, তা থেকে তারা যেন বঞ্চিত না হয়। মাইকেল মধুসূদনের মতো ইংরেজি ভাষায় পন্ডিত চুড়ামণি কবিকেও বলতে হয়,

''হে বঙ্গ ভান্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।''

মধুসূদন ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি। প্রথম জীবনে তিনি ইংরেজি সাহিত্যে আকৃষ্ট হন এবং ইংরেজ কবি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। এমনকি খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করে মাইকেল মধুসূদন হয়েছিলেন। কিন্তু পরে বাংলা সাহিত্যে ফিরে এসে বাংলা সাহিত্যের এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেন। তিনি বাইরে ক্রিশ্চান হলেও অন্তরে খাঁটি হিন্দু ছিলেন। মহাকবি তার জীবনের অন্তিম কালে নিজেকে শ্রীমধুসূদন নামে উল্লেখ করে গেছেন। তাঁর সমাধিস্থলে খোদাই করা এই পংক্তিগুলি তার প্রমাণ—

''দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে (জননীর কোলে শিশু লভয়ে যে মতি বিরাম) মহীর পদে মহা নিদ্রাবৃত দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন! যশোরে সাগরদাঁড়ি কপোতাক্ষ-তীরে জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী।''

বাঙালি হয়েও যদি কেউ রবীন্দ্রনাথকে আপন করে কাছে না পায় তবে তার বাঙালি হয়ে জন্মগ্রহণই বৃথা। আমার মনে হয় শুধু রবীন্দ্রনাথকে জানার জন্য বিশ্বকে বাংলা শিখতে হবে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল, কবিগুরুর ১৫৫ তম জন্ম দিবসে (৮ই মে ২০১৬) চীন প্রথমবার চীনা ভাষায় ৩৩ খন্ডে রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশ করে বিশ্বকবিকে সম্মান জানায়। এই অনুবাদ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পাঁচ বছর সময় লাগে। এর আগেও রবীন্দ্রনাথের বহু লেখা চীনা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলো করা হয়েছিল ইংরেজি ভাষা থেকে চীনা ভাষায়। তাই সেগুলো কোনোটাই জুতসই হয়নি। বাধ্য হয়ে অনুবাদকগণকে বাংলাদেশে গিয়ে এবং বিশ্বভারতীতে এসে রীতিমতো বাংলা ও সংস্কৃত

“বাঙালি হয়েও যদি কেউ রবীন্দ্রনাথকে আপন করে কাছে না পায় তবে তার বাঙালি হয়ে জন্মগ্রহণই বৃথা। আমার মনে হয় শুধু রবীন্দ্রনাথকে জানার জন্য বিশ্বকে বাংলা শিখতে হবে।”

ভাষা রপ্ত করে, বাংলায় রবীন্দ্রনাথ পড়ে তারপর চীনা ভাষায় রবীন্দ্ররচনা অনুবাদ করতে হয়েছিল। চীনা ভাষায় রবীন্দ্ররচনাবলীর প্রধান অনুবাদক ডং ইউ চেন রাশিয়ার লেলিনগ্রাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন এবং বাংলায় রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠ করে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

হেলেন কেলার ছিলেন বাক- শ্রবণ ও দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী। ১৯৩০ সালে নিউইয়র্কে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। রবীন্দ্র অনুরাগী হেলেন কেলার কবিকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিলেন। সাক্ষাতের সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ''আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনী'' গানটি নিজে গেয়ে শুনিয়েছিলেন। যেহেতু হেলেন কেলার দেখতে ও শুনতে পারতেন না তাই যখন কবি গানটি গাইছিলেন, তখন হেলেন কেলার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঠোঁট স্পর্শ করে গানটি অনুধাবন করেন।

বিশ্বকবি ছাড়াও বাংলা সাহিত্যে আরও বহু দিকপাল রথী- মহারথীরা রয়েছেন যারা বিশ্ব সাহিত্যের আসরে কম প্রতিভাধর নন। তাই বাংলা সাহিত্য কখনোই অবজ্ঞার বিষয় নয়।

বর্তমানে অনেকে বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে কথা বলেন। এর কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। আবার কেউ কেউ বাংলাভাষী মানুষদের সঙ্গে কথা বলার সময়ও ইংরেজিতে লেকচার ঝেড়ে নিজেকে কেউকেটা প্রতিপন্ন করতে চায়। আবার অনেককে বলতে শুনেছি যে, বিদেশে বহুদিন থাকার জন্য বাংলাটা ঠিক আসে না। এগুলি সবই বাজে কথা। ইচ্ছাকৃতভাবে ভুলতে না চাইলে মাতৃভাষা কখনো ভোলা যায় না। অমর্ত্য সেন প্রমুখ বহু প্রবাসী বাঙালি কেমন সুন্দর বাংলা বলেন, তা সকলের কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

এ প্রসঙ্গে আমার একটি অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করছি। এলসেভিয়ার প্রকাশনা সংস্থার লন্ডন থেকে প্রকাশিত একটি বিখ্যাত জার্নালে আমার একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হওয়ার পর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সাইন্স অ্যাকাডেমি (আইএনএসএ) ১৯১২ সালে লক্ষ্মৌ শহরের বায়োটেক পার্কে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান সভায় বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ জানায়। সেখানে পদ্মভূষণ ও পদ্মশ্রী প্রাপ্ত বহু বিজ্ঞানী উপস্থিত ছিলেন। বেশিরভাগ বিজ্ঞানীরাই ছিলেন অবাঙালি। দুই দিনের এই সেমিনারে আমাদের ভাব বিনিময় ও বাক্যালাপের মাধ্যম ছিল ইংরেজি। তামিলনাড়ু থেকে একজন বাঙালি গবেষক বিজ্ঞানী এসেছিলেন। তিনি সময় সুযোগ পেলেই আমার সঙ্গে বাংলায় গল্পে মেতে উঠতেন। উনি তখন যেখানে কর্মরত ছিলেন সেখানে বাংলায় কথা বলার সুযোগ ছিল না। তাই আমার সঙ্গে বাংলায় মন খুলে গল্প করতেন। আমি অনুভব করেছিলাম যেখানে পানীয় জলের সংকট সেখানে পানীয় জলের গুরুত্ব কতটা অপরিসীম।

বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য আমাদের সকলের বাংলা ভাষায় লেখা বই, পত্র-পত্রিকা পাঠ করা ও লেখা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাইতো কবি বলেছেন—

''মোদের গরব, মোদের আশা,
আ মরি বাংলা ভাষা!
তোমার কোলে,
তোমার বোলে,
কতই শান্তি ভালোবাসা!'' ❑

সংক্ষেপে

নিউ টাউনে পূর্বভারতের বৃহত্তম বেসরকারি হাসপাতাল নারায়ণা হেলথ সিটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

সুদীপ্তা দাস : পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যসেবায় বিপ্লব ঘটাতে তার মিশনকে শক্তিশালী করতে নারায়ণা হেলথ গত ২০ ফেব্রুয়রি কোলকাতার নিউ টাউনে তাদের বৃহত্তম উদ্যোগ 'নারায়ণা হেলথ সিটি'-র ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন করল। পূর্ব ভারতের বৃহত্তম বেসরকারি হাসপাতালের ইউনিটে পরিণত হতে চলেছে। এই অত্যাধুনিক মাল্টি স্পেশালিটি সুবিধাটি এই অঞ্চলের স্বাস্থ্যসেবা পরিকাঠামোকে উল্লেখযোগ্য ভাবে উন্নত করবে। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এবং নারায়ণা হেলথ-এর চেয়ারম্যান ও প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ দেবী প্রসাদ শেট্টির উপস্থিতিতে এর ভিত্তি প্রস্তর উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্রী মনোজ গুপ্ত (চিফ সেক্রেটারি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শ্রী হরি কৃষ্ণা দ্বিবেদী (ভাইস চেয়ারম্যান, ওয়স্ট বেঙ্গল হিডকো), শ্রী আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় (চেয়ারম্যান, এনকেডিএ, ওয়েস্ট বেঙ্গল), শ্রী নারায়ণস্বরূপ নিগম (প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারি, হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট, পশ্চিমবঙ্গ), মিঃ আর. ভেঙ্কটেশ (গ্রুপ সিইও, নারায়ণা হেলথ), ডঃ ইম্মানুয়েল রুপার্ট (ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং গ্রুপ সিওও, নারায়ণা হেলথ) এবং সি.পি মিঃ অভিজিৎ।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেন, ১০ লক্ষ বর্গ ফুট এলাকা নিয়ে এই হাসপাতালটি তৈরি হচ্ছে। অত্যাধুনিক পরিকাঠামো এবং সর্বশেষ প্রযুক্তিতে সজ্জিত হবে। কোলকাতা নিউ টাউনের এই নারায়ণা হেলথ সিটি ১,১০০ শয্যা বিশিষ্ট ফ্ল্যাগশিপ ক্যাম্পাস। পরবর্তীকালে শয্যা সংখ্যা ২৫০০-তে সম্প্রসারিত করবে। থাকবে অঙ্কোলজি, কার্ডিয়াক সায়েন্স, অর্থোপেডিক্স, অঙ্গ প্রতিস্থাপন, অ্যাডভান্সড ট্রমা কেয়ার, নিউরোলজি, গ্যাস্টোএন্টারোলজি, রেনাল সায়েন্স এবং ক্রিটিকাল কেয়ারের মতো একাধিক সেন্টার অফ অ্যাক্সিলেন্স।

উচ্চমানের স্বাস্থ্য-সেবার অগ্রহণী হিসেবে নারায়ণা হেলথ কোলকাতা তথা পূর্ব ভারতের জনগণকে সেবা দিয়ে আসছে। বর্তমানে হাওড়া ও চুনাভাটি, বারাসাত ও মুকুন্দপুরের পর কোলকাতায় পঞ্চম ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সাথে সাথে নারায়ণা পূর্ব ভারতের বৃহত্তম স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে পরিণত হবে।

সাধ্যের মধ্যে কলকাতা এবং এর আশেপাশের এলাকায় অত্যাধুনিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য নারায়ণা হেলথের দীর্ঘস্থায়ী প্রতিশ্রুতির উপর জোর দিয়ে ডাঃ শেট্টি বলেন, বছরের পর বছর ধরে, নারায়ণা হেলথ সারা ভারত জুড়ে বিশ্বমানের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য নিবেদিত। কলকাতার রোগীরা যাতে অন্যান্য মেট্রোপলিটন শহরে ভ্রমণের প্রয়োজন ছাড়াই উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পেতে পারে তা নিশ্চিত করতে এই পদক্ষেপ। আমি পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে চাই, হাসপাতালের ইউনিটের ভিত্তি স্থাপনের জন্য সময় দেওয়ার জন্য। তার সাহায্য এই অঞ্চলের স্বাস্থ্যসেবা পরিকাঠামোর বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

নতুন হাসপাতাল সম্পর্কে সমানভাবে উৎসাহী, ডঃ ইমানুয়েল রুপার্ট (ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং গ্রুপ সিইও, নারায়ণা হেলথ) ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে বলেন, নারায়ণা হেলথ সিটি, নিউ টাউন, কলকাতার সবচেয়ে বড় বেসরকারি হাসপাতাল হবে। এটি সমস্ত উন্নত প্রযুক্তি তথা বিশ্বের উন্নত প্রযুক্তির চিকিৎসা দেবে। এই সম্প্রসারণ উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতিকে শক্তিশালী করে, যাতে রোগীরা সর্বোচ্চ চিকিৎসা এবং ক্লিনিকাল ফলাফল পান। বিশেষায়িত চিকিৎসার বাইরে, যত্ন এবং জরুরি চিকিৎসার ক্ষমতাকেও শক্তিশালী করবে।

শ্রী আর ভেঙ্কটেশ (গ্রুপ সিওও, নারায়ণা হেলথ) এই দিকটিকে গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, ক্রমবর্ধমান চিকিৎসার জরুরি অবস্থার সাথে, একটি সুসজ্জিত ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট থাকা আর ঐচ্ছিক নয়—এটি অপরিহার্য। এই সম্প্রসারণটি বিশ্বমানের পরিকাঠামোর সাথে জটিল এবং জরুরি কেস পরিচালনা করার জন্য কলকাতার ক্ষমতাকে উন্নত করবে।

এইচ.সি.জি ক্যানসার সেন্টারে রোবোটিক অঙ্কো কনক্লেভ

সুদীপ্তা দাস : এইচ.সি.জি ক্যানসার সেন্টার নিউ টাউন, কোলকাতায় 'দ্য ভিঞ্চি এক্স রোবোটিক সার্জারি সিস্টেম' চালু করল। এই উপলক্ষে প্রখ্যাত ক্যানসার বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এইচ.সি.জি রোবোটিক অঙ্কো কনক্লেভের আয়োজন করল। এই উপলক্ষে গত ৪ ফেব্রুয়ারি কোলকাতার প্রেস ক্লাবে ক্যানসার বিশেষজ্ঞদের একটি ক্লা চকে একত্রিত করে, যেখানে তারা তাদের নিজ নিজ বিভাগের ক্যানসারের চিকিৎসায় রোবোটিক চিকিৎসার সুবিধা এবং অগ্রগতির দিকগুলি তুলে ধরেন। কনক্লেভে উপস্থিত ছিলেন এইচ.ও.ডি সিনিয়ার কনসালট্যান্ট এবং বিশেষজ্ঞ হেড অ্যান্ড নেক অঙ্কো ডাঃ রাজীব শরণ, জি আই অঙ্কোলজি পরামর্শদাতা এবং বিশেষজ্ঞ ডাঃ এস. কে. বালা, এইচ.ও.ডি সিনিয়ার কনসালট্যান্ট এবং বিশেষজ্ঞ সার্জিক্যাল ইউরো-অঙ্কোলজি ডাঃ গৌরব আগরওয়াল, কনসালট্যান্ট এবং বিশেষজ্ঞ সার্জিক্যাল গাইনো-অঙ্কোলজি এবং অবস্টেট্রিকস অঙ্কো ডাঃ সুব্রত দেবনাথ, কনসালট্যান্ট এবং বিশেষজ্ঞ থোরাসিক সার্জেন ডাঃ প্রিয়া এসফুনিয়ানি, ছিলেন সহযোগী কনসালট্যান্ট এবং জিআই সার্জিক্যাল অঙ্কোলজি বিশেষজ্ঞ ডাঃ করণ সেহগাল। সকলেই ক্যানসারের চিকিৎসায় রোবোটিক সার্জারির উল্লেখযোগ্য সুবিধাগুলির উপর আলোকপাত করেন।

এইচসিজি রোবোটিক অনকো কনক্লেভ। এটি শহরের একটি অগ্রগামী ইভেন্ট যা আমাদের অনকো বিশেষজ্ঞদের দলকে ক্যান্সার রোগীদের সর্বোত্তম চিকিৎসার জন্য অত্যাধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে রোবোটিক্সের শক্তিকে একত্রিত করে চিকিৎসায় নতুন দিক উপস্থাপন করে। এইচ.সি.জি ক্যান্সার সেন্টারে (নিউ টাউন) 'দ্য ভিঞ্চি এক্স রোবোটিক সার্জারি সিস্টেম' চালু করা কলকাতায় ক্যান্সারের রোগীদের সার্জারির পূর্বের সময়কে অনেক কমিয়ে আনবে এবং ক্যান্সারের রোগীদের পুনরায় চিকিৎসার সুযোগ দেবে। জটিলতার ঝুঁকি কম, বলেছেন মিস্টার প্রতীক জৈন (আঞ্চলিক প্রধান, ইস্ট অ্যান্ড এপি, থে কেয়ার গ্লোবাল)।

দা ভিঞ্চি এক্স রোবোটিক সার্জারি সিস্টেমটি অতুলনীয়। নির্ভুলতা, নমনীয়তা এবং নিয়ন্ত্রণের সাথে জটিল সার্জারি সম্পাদনে সার্জনদের সহায়তা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটিতে উন্নত প্রযুক্তি সহ রোবোটিক চারটি বাহু রয়েছে যা শরীরের হার্ড-টু-নাগালের জায়গায় সুনির্দিষ্ট ভাবে নড়াচড়া করতে পারে। সার্জনরা একটি কনসোল থেকে সিস্টেমটিকে দূরবর্তীভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের একটি ৩ডি ভিউ এবং অস্ত্রোপচারের স্থানের বর্ধিত পরিবর্ধন প্রদান করে।

ফার্মাসিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের ত্রিবার্ষিক রাজ্য সম্মেলন ঘাটালে

অরুণাভ বেরা, ঘাটাল : ফার্মাসিস্টস অ্যাসোসিয়েশন, ওয়েস্ট বেঙ্গল এর ত্রি-বার্ষিক রজত জয়ন্তী রাজ্য সম্মেলন আয়োজিত হল ঘাটাল টাউন হলে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত দু'দিনের সম্মেলনে সারা রাজ্য থেকে ৬৫০ জন প্রতিনিধি যোগ দেন বলে জানান অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদক সব্যসাচী হাইত। সব্যসাচী বাবু বলেন, পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান ঘাটাল মহকুমাতে রাজ্য সম্মেলন হওয়াতে তারা গর্বিত। প্রথম দিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো, ঘাটালের মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস, দাসপুরের বিধায়ক মমতা ভূঁইয়া সহ অন্যান্যরা। ছিলেন অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সভাপতি সুবিমল বর্মন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সম্মেলনে ফার্মাসিস্টদের পেশাগত বিভিন্ন সমস্যার দিক আলোচনা হয়। মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো ফার্মাসিস্টদের পেশাগত দিক সম্বন্ধে বলেন। মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস একসময় ফার্মাসিস্ট ছিলেন। তিনি এই পেশার বিভিন্ন বিষয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলেন। সম্মেলন উপলক্ষে ঘাটাল বিদ্যাসাগর হাই স্কুলে এক রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়। ফার্মাসিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এই রক্তদান শিবিরে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিরা রক্তদান করেন। পাশাপাশি এলাকার স্থানীয় ব্যক্তিরাও রক্তদান করে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

যোগা ও ন্যাচারোপ্যাথি নিয়ে ওয়ার্কশপ

নিজস্ব সংবাদদাতা : সম্প্রতি দাসপুর গান্ধী মিশনের উদ্যোগে চার দিন ধরে যোগা এবং ন্যাচারোপ্যাথির ওপর ওয়ার্কশপ হল। যোগা এবং ন্যাচারোপ্যাথির সাহায্যে কীভাবে সুস্থ থাকা যায় সেই বিষয়ে আলোচনা করেন বিশেষজ্ঞরা। গান্ধী মিশন ট্রাস্টের কর্ণধার নারায়ণ ভাই এই অনুষ্ঠানে বলেন, যোগা এবং ন্যাচারোপ্যাথি বিষয়ে ডিপ্লোমা কোর্স করানো হয় দাসপুর গান্ধী মিশনে। উড়িশা, অসম ও এ রাজ্যের রায়গঞ্জ, পুরুলিয়া, কাঁথি থেকে বেশ কয়েকজন এসেছেন এই প্রশিক্ষণ শিবিরে। যোগা এবং ন্যাচারোপ্যাথি বিষয়ে ডিপ্লোমার মাধ্যমে স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ করে দেয় গান্ধী মিশন।

পশ্চিমবঙ্গ আয়ুর্বেদ চিকিৎসক সমিতির ১২তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৩ জানুয়ারি ২০২৫, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ সভাকক্ষে পশ্চিমবঙ্গ আয়ুর্বেদ চিকিৎসক সমিতি ও গভর্নমেন্ট আয়ুর্বেদ ডক্টরস্ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে সি এম ই অনুষ্ঠানের ১২ তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ নীলরতন মহাপাত্র উদ্বোধনী ভাষণে সি এম ই-এর গুরুত্ব এবং ধারাবাহিকতা নিয়ে আলোচনা করেন। এই অনুষ্ঠানে চারজন আয়ুর্বেদ চিকিৎসক বক্তব্য রাখেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে কর্মরত আয়ুর্বেদ চিকিৎসক ডাঃ নেহা মিশ্র 'বিষাদ এবং অবসাদে আয়ুর্বেদের ভূমিকা' নিয়ে আলোচনা করেন। রঘুনাথ আয়ুর্বেদ মহাবিদ্যালয় ও হাসপাতালের শল্য বিভাগের অধ্যাপক ডঃ শান্তনু পান্ডা অর্শ -ভগন্দর-পরিকর্তিকার মতো রোগে আয়ুর্বেদের ক্ষার সূত্র প্রয়োগ ও তার প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। হিমালয় ড্রাগ কোম্পানির সায়েন্টিফিক সার্ভিসের ম্যানেজার ডঃ শুভেন্দু শঙ্কর কর মধুমেহ রোগ জনিত কারণে যকৃত রোগ এবং আয়ুর্বেদে তার প্রতিকার সম্পর্কে ব্যাখা করেন। আত্রেয় ইনফোটেক কোম্পানির পক্ষ থেকে শ্রী চিরাগ চবন যান্ত্রিক উপায়ে প্রকৃতি পরীক্ষা পদ্ধতি হাতেকলমে করে দেখান। এই অনুষ্ঠানটি কবিরাজ বুধ কুমার মিশ্রের স্মরণে আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় ১৫০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

কবি ভবানী প্রসাদ মজুমদারের প্রয়াণ বার্ষিকী স্মরণ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ব্যাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরি হলে অনুষ্ঠিত হয় কবির প্রথম বার্ষিক স্মরণ সভা। কবি জায়া পদ্মা মজুমদার, কন্যা, জামাতা ও দৌহিত্রী ও অনুরাগীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় কবির প্রথম স্মরণ সভা। এই সভায় সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রেমী ও কবি অনুরাগীরা যোগ দেন বিভিন্ন জায়গা থেকে। ছড়াকার সুব্রত ভট্টাচার্য, রূপক চট্টরাজের মতো কবি-ঘনিষ্ঠরা ছাড়াও অন্যান্য গুণীজনেদের স্মৃতি চারণায় ভবানীবাবুর সাহিত্য-জীবনের নানা দিক উন্মোচিত হয় নতুন করে। আগামীদিনে, ভবানীপ্রসাদ মজুমদার স্মৃতি কমিটি গঠন করে সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার উদ্দেশ্যে ভবানীপ্রসাদ সমগ্র প্রকাশ ও অন্যান্য কর্মসূচি কার্যকর করার প্রস্তাব নেওয়া হয়।

বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা ও রক্তের গ্রুপ নির্ণয়

নিজস্ব সংবাদদাতা : দুঃস্থদের জন্য বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হল খড়্গপুর-১ নম্বর ব্লকের অর্জুনী পল্লী উন্নয়নী জ্ঞান মন্দির উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। মানিকপাড়া বিবেকানন্দ এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি আয়োজিত এই চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে তিন শতাধিক বৃদ্ধ-বৃদ্ধা চক্ষু পরীক্ষা করান বলে জানিয়েছেন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ও মানিকপাড়া বিবেকানন্দ এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির সম্পাদক গৌতম কুমার ভকত।

গৌতম বাবু জানান, শিবিরে আগত পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সমস্ত চক্ষু রোগীদের এই শিবির থেকে বিনামূল্যে ছানি অপারেশন করানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৩২৩ জন চক্ষু পরীক্ষা করান এবং ১১০ জন ছানি অপারেশনের জন্য বিবেচিত হন। চৈতন্যপুর বিবেকানন্দ মিশন আশ্রম, নেত্র নিরাময় নিকেতনের বিশেষজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসক মন্ডলীর তত্ত্বাবধানে এই শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

এই চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিভা রানী মাইতি, জেলা পরিষদেরজনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ আবু কালাম বক্স, খড়্গপুর ১নং ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌমেন কুমার দাস, কলাইকুন্ডা থানার এ এস আই অসীম কুমার ব্যানার্জী, জেলা পরিষদ সদস্যা সুমিতা মান্ডি, মিদনাপুর ডিস্ট্রিক্ট ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরামের চেয়ারম্যান অসীম ধর, ইউ এ এল বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেডের পারসোনাল ম্যানেজার সঞ্জয় সিং, বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

প্রগতিমেলায় রক্তদান, সুগার টেস্ট ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আমতার উদং উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৮ তম প্রগতিমেলায় প্রতি বছরের মতো ছিল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। তার সঙ্গে ছিল বিনা ব্যয়ে ই.সি.জি, সুগার টেস্ট এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা। আর স্বাস্থ্য শিবিরটি পরিচালনা করে আমতার মহাবীর নার্সিং হোম। নার্সিংহোমের ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের তত্বাবধানে বহু মানুষ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন সুশান্ত কুমার চক্রবর্তী। প্রগতি মেলার সভাপতি প্রদীপ রঞ্জন রীত বলেন, প্রতি বছরই আমরা প্রগতি মেলায় বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচি রাখি এবং অবশ্যই তা বিনা ব্যয়ে। গ্রামের দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াতেই আমাদের এই প্রয়াস। প্রতি বছর এই ই.সি.জি, সুগার টেস্ট কিংবা হেলথ চেক আপ করার সুযোগ গ্রহণ করে থাকেন বহু মানুষ। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পাঁচ দিনের এই শিক্ষা ও সংস্কৃতি মূলক মেলায় মানুষের ভিড় উপছে পড়েছিল। হাওড়া জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন এই মেলায়।

রেড ক্রশের উদ্যোগে শিশুস্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঘাটাল : ভারতীয় রেড ক্রশ সোসাইটির ঘাটাল মহকুমা শাখার উদ্যোগে অতি সম্প্রতি রাধানগর চন্দননগর সেন্টারে দুঃস্থ শিশুদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির হল। ৭৬ জন শিশুর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় এবং বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হয়। শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ শিশির দাস। ছিলেন ভারতীয় রেডক্রশ সোসাইটি তথা ঘাটাল মহকুমা শাখার রিলিফ ইনচার্জ শুভদীপ সিংহরায়, কোষাধ্যক্ষ রামমোহন চক্রবর্তী, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক তাপস পোড়েল, মহারাজপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুভাষ দত্ত সহ অন্যান্যরা।

মানসিক

ভাঙছে সমাজ বাড়ছে সমস্যা। ঘরে-বাইরে বাড়ছে মানসিক টানাপোড়েন। ফলে সমস্যাও বেড়ে চলেছে হু-হু করে। ব্যাপকভাবে বেড়ে-চলা মানসিক সমস্যা নিয়ে এই বিভাগে পাঠকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে হাজির শহরের বিশিষ্ট মনস্তত্ত্ববিদ।

পার্থ প্রতিম রায়
(মনস্তাত্ত্বিক কাউন্সেলর)
মোবাইল : ৮৬১৭৭৯২৪৫৯
ই-মেল : parthapratimroy08@gmail.com

প্রশ্ন

আমার বাবা ডিমেনশিয়ার রোগী। ডিমেনশিয়া রোগ থেকে কীভাবে সেরে উঠবে? আদৌ কি সুস্থ হবে?

সান্ত্বনা
করণদিঘি,উঃ দিনাজপুর।

উত্তর

ডিমেনশিয়া সাধারণত বার্ধক্য জনিত অসুখ। কম বয়সীদের ডিমেনশিয়া হয় না। ৫০-এর উর্ধ্বে মানুষের ডিমেনশিয়া হয়। তার নিচে হলে অনেক সময় সেটা এমনেশিয়া হতে পারে। এমনেশিয়া চিকিৎসায় ভালো হয়ে যায়। যা ডিমেনশিয়ার ক্ষেত্রে হয় না। ডিমেনশিয়ার ক্ষেত্রে আমাদের স্মৃতি কোষ মরে যেতে থাকে। ফলে এটাকে আর ফিরিয়ে আনা যায় না। চিরকালীনভাবে স্মৃতি হারিয়ে যেতে থাকে। এ ক্ষেত্রে কোনো মনোরোগ বিশেষজ্ঞকে দেখালে তিনি যেটা করতে পারেন, রোগীকে দেখে প্রয়োজনীয় ওষুধ দিতে পারেন। তার ফলে নিরন্তর হারিয়ে যেতে থাকা স্মৃতিকোষগুলোকে খানিকটা ঠেকিয়ে রাখা যেতে পারে। অর্থাৎ স্মৃতি হারানোর বিষয়টাকে ধীর গতি করে দেওয়া যেতে পারে। ফলে দুই তিন বছরের মধ্যে যে পরিমাণ স্মৃতি হারানোর সম্ভাবনা থাকে, সেটাকে ওষুধ দিয়ে ৭ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া যায়। জরুরি বিষয় হল সঠিক মনোরোগ বিশেষজ্ঞকে খুঁজে বার করা । এছাড়াও একজন মনস্তাত্ত্বিকের সাহায্য নেওয়া দরকার যিনি বলে দিতে পারেন বাড়ির লোকেদের কী করণীয়। কীভাবে স্মৃতি হারিয়ে যাওয়া এই মানুষটার পরিচর্যা হওয়া দরকার। সেটা তিনিই বলে দিতে পারবেন। তার ফলে, দুই ধরনের চিকিৎসার মধ্যে দিয়ে বেশ কিছুদিন ডিমেনশিয়া বা স্মৃতি হারানোর হাত থেকে মানুষটাকে বাঁচিয়ে রাখা যেতে পারে।

প্রশ্ন

ওভারথিংকিং থেকে বাঁচার উপায় কী?কোনো একটা সামান্য কারণে ওভারথিংকিং হয়। ছোট একটা অসুখ হলেও মনে হয় এই অসুখে মারা যাব। খোলা মাঠে বসে থাকলে মনে হয় কোনো বিমান এসে আমার উপর পড়বে। রাস্তা দিয়ে হাঁটলে মনে হয় কোনো গাড়ি এসে ধাক্কা দেবে। যার কারণে অস্থিরতা বাড়তে থাকে এবং অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো। অবস্থা হয়।

স্বাতী
ছাতনা, বাঁকুড়া।

উত্তর

ম্যাডাম, আপনার চিঠি পড়ে যা স্পষ্ট হচ্ছে, তা হল যে কারণেই হোক, আপনার মন চিন্তাপ্রবণ হয়ে উঠেছে এবং প্রায়ই আপনি নেতিবাচক ভাবনার ফাঁদে আটকে যাচ্ছেন। অতিরঞ্জিত চিন্তা বা ওভারথিংকিং যতক্ষণ না নেতিবাচক ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলে বা আপনাকে আতঙ্কিত করে তোলে, ততক্ষণ তা ক্ষতিকর নয়। কিন্তু যখনই এই অতিরঞ্জিত চিন্তা আপনার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায় এবং আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে, তখন এটিকে আর সাধারণ অতিরঞ্জিত ভাবনার মধ্যে ফেলা যায় না ।

আপনার এই ধরনের নেতিবাচক এবং অপ্রয়োজনীয় ভাবনাগুলোকে মনোবিজ্ঞানের ভাষায় অবসেশন বলা হয়। এর মূল কারণ হল আপনার মনের গভীরে থাকা দুশ্চিন্তা, যা সারাক্ষণ যেন এক প্রেমিকের মতো আপনাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে। এই দুশ্চিন্তার কারণেই আপনার মানসিক অবস্থা অ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডার-র দিকে ঝুঁকে পড়েছে। সাধারণত আমাদের মস্তিষ্কে সেরোটোনিন হরমোনের নিঃসরণ কমে গেলে এমন সমস্যা দেখা দেয়।

প্রাথমিকভাবে কিছু করণীয়—

এই সমস্যার মোকাবিলায় শুরুতেই আপনি কিছু সহজ ও প্রাকৃতিক পদ্ধতি চেষ্টা করতে পারেন। যেমন—

১. যোগব্যায়াম বা ফ্রিহ্যান্ড ব্যায়াম : প্রতিদিন ২০ থেকে ২৫ মিনিট ব্যায়াম করুন। এটি আপনার শরীর ও মনের জন্য বিশেষ উপকারি।

২. সাঁতার কাটা : যদি সুযোগ থাকে, প্রতিদিন পুকুরে বা সুইমিং পুলে সাঁতার কাটুন। এটি আপনার শরীরের পেশি যেমন সক্রিয় করবে, তেমনই মস্তিষ্কেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

৩. ডিপ ব্রিদিং : নিয়মিত গভীরভাবে শ্বাস নেওয়ার অভ্যাস করুন। ডিপ ব্রিদিং মস্তিষ্ককে শিথিল করতে সাহায্য করে এবং উদ্বেগ কমায়।

জীবনযাত্রায় কিছু পরিবর্তন আনুন—

দুশ্চিন্তা কমানোর জন্য আপনার দৈনন্দিন জীবনে কিছু ছোট পরিবর্তন আনাই যথেষ্ট। যেমন—

- চা ও কফির পরিমাণ কমান। ক্যাফেইন আপনার উদ্বেগকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।
- মশলাদার খাবার নিয়ন্ত্রণ করুন। মশলাদার খাবার কম খেলে হজম ভালো হয় এবং শরীর হালকা থাকে।
- শৃঙ্খলিত খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলুন। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ করুন। পর্যাপ্ত জল পান করুন। প্রতিদিন অন্তত চার লিটার জল পান করার চেষ্টা করুন। এটি আপনার শরীরের টক্সিন দূর করতে সাহায্য করবে।
- বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটান। সামাজিক

মেলামেশা, আড্ডা এবং মজার হাসাহাসি আপনার মানসিক অবস্থা উন্নত করতে পারে।

• কথা বলার অভ্যাস গড়ে তুলুন। বন্ধু বা কাছের মানুষের সঙ্গে মন খুলে কথা বলুন এবং তাদের কথা মন দিয়ে শুনুন। এটি আপনার মানসিক চাপ অনেকটাই লাঘব করবে।

এসব অভ্যাসগুলো মেনে চললে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন, দুশ্চিন্তার বিষাক্ত ফণা ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছে। এগুলো আসলে বিনা বিনিয়োগের চিকিৎসা পদ্ধতি। তবে এগুলো যদি মেনে চলা সম্ভব না হয়, তাহলে দুশ্চিন্তা আপনার জীবনকে আরও জটিল করে তুলতে পারে। তাই দুশ্চিন্তার কামড় থেকে মুক্তি পেতে আজ থেকেই এই অভ্যাসগুলো রপ্ত করা শুরু করুন।

প্রশ্ন

আমি অত্যন্ত শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে। কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। কলেজের একটি ছেলের সাথে আলাপ হয়েছে, বন্ধুত্ব হয়েছে। তেমন কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। তবে একটা ভালো লাগা তৈরি হয়েছে। কিন্তু ওর মধ্যে কিছু অদ্ভুত আচরণ খেয়াল করছি। যেটা আমাকে মানসিকভাবে পীড়া দেয়, সেটা হল প্রচন্ড মিথ্যা কথা বলে। যেখানে প্রয়োজন নেই, ছোটখাটো বিষয়ে নানা কারণে অহেতুক সে মিথ্যে বলে। ওর কোনো লাভ নেই ক্ষতি নেই এরকম নানা বিষয়ে মিথ্যা কথা বলে। ধরা পড়লে আবার নতুন কোনো একটা মিথ্যে কথা সাজাতে থাকে। এর ফলে এক ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হচ্ছে । এটা কি কোনো মানসিক রোগ নাকি এটা নিছকই একটা মজা করার অছিলা। এই বিষয়ে যদি একটু আলোকপাত করেন।

মোনালি

উত্তর

কিছু মানুষ আছে যারা প্রতিনিয়ত মিথ্যে কথা বলে এবং এই মিথ্যে কথা বলাটা তাদের একটা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। বাস্তবে মিথ্যে বলাটা একটি মানসিক অসুখ। যেটাকে প্যাথলজিকাল লাইং বলা হয়। মনস্তত্ত্বে এর আবার আরেকটি মিষ্টি পোশাকি নাম আছে যেটাকে সিউডোলোজিয়া ফ্যান্টাস্টিকা বলে অভিহিত করা হয়। এই মিথ্যে বলার পেছনে কোনো পরিষ্কার উদ্দেশ্য নেই। কোনো কারণ নেই। মানুষ সাধারণত মিথ্যে কথা বলে যে যে কারণে, যেমন শাস্তি এড়ানো, কোনো বিপদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য, অন্যকে বাঁচানোর জন্য, কোনো লাভ অর্জনের জন্য, স্বার্থসিদ্ধির জন্য—এরা এ সমস্ত কোনো কারণে মিথ্যে কথা বলে না। এরা মিথ্যে কথা বলার জন্যই মিথ্যে কথা বলে এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে মিথ্যে কথা বলে। তার ফলে এদের ব্যক্তিগত জীবন, পেশাগত জীবন, সামগ্রিকভাবে নিজেরাই নিজেদের জীবনকে প্রত্যক্ষভাবে বা অ-প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে । প্রথমত প্রতিনিয়ত মিথ্যে বলতে বলতে ওটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে যায় এবং মিথ্যে বলাটা এতটাই বিস্তৃত, এতটাই বাস্তবসম্মত বলে মনে হয়, যে সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে উঠতে পারেন না যে একজন ব্যক্তি এভাবে মিথ্যে বলছেন।

সমস্যা হল এরা কেন এমনটা করে?

মূলত এদের ব্যক্তিত্বজনিত কিছু কিছু সমস্যা থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় এরা অ্যান্টিসোশ্যাল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার, নার্সিসিস্টিক পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার বা হিস্ট্রিওনিক পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডারের মতো অসুখে ভুগছে। সেটা অন্য কারুর চোখে পড়ছে না, বা যিনি মিথ্যে বলছেন তারও এই বিষয়গুলো জানা নেই। এছাড়া স্নায়বিক সমস্যা, আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং উদ্বেগপ্রবণতা এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলো যদি চরিত্রের মধ্যে থাকে সেক্ষেত্রে এরা এই অসুখটাকে বহন করে নিয়ে যায়। বাড়ির লোকেরা প্রতিনিয়ত এই বিষয়টাকে নজরে এনে রোগীকে যদি চিকিৎসায় রাজি করাতে পারেন, সেক্ষেত্রে সাইকোথেরাপি বিশেষত কগনিটিভ বিহেভিয়ারাল থেরাপি এবং উদ্বেগ কমানোর ওষুধ খুব ভালো ফল দিতে পারে। ব্যক্তিগত স্তরে প্রতিনিয়ত বেশ কিছুদিন ধরে কাউন্সেলিং চালিয়ে গেলে এই অসুখের হাত থেকে বাঁচার একটা সম্ভাবনা তৈরি হয়।

প্রশ্ন

শুচিবায়ু রোগের কোনো চিকিৎসা আছে?

স্বপ্না রায়

বাঁশতলা, কল-১৪৯

উত্তর

শুচিবায়ু রোগের চিকিৎসার জন্য অবশ্যই মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যেতে হবে। তারপর নিয়মিত কাউন্সেলিং করাতে হবে। এতে করে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে পারবে রোগী।

প্রশ্ন

আমি এগারো ক্লাসে পড়ি। সম্প্রতি আমাদের ক্লাশের একটি ছেলে আমাকে মোবাইলে কথা বলার সময় হঠাৎ করে প্রপোজ করে বসে। আমাকে বলে ওর প্রস্তাবে আমার সায় আছে কি না জানাতে হবে। প্রেমের প্রস্তাব পেয়ে আমি পড়া ভুলতে বসেছি, কী বলব ভেবেই আমার মানসিক চাপ তৈরি হচ্ছে। বাবা ভীষণ রাগী, জানলে পড়া ছাড়িয়ে দেবে, যা আমি একদম চাই না। আমার কী করণীয় যদি বলে দেন?

স্বপ্না

সূর্য সেন নগর, খড়দহ, উত্তর ২৪ পরগনা

উত্তর

স্বপ্না, তোমার কথামতো নাম পরিবর্তন করে দিলাম। বুঝতে পারছি তুমি একটু ঘাবড়ে গেছো। দেখ তুমি কারোর সাথে প্রেম করবে কি না সেটা তোমার একান্ত ব্যক্তিগত। এ ব্যাপারে পরামর্শ নেওয়াটা যুক্তিযুক্ত হবে না। তাছাড়া তোমার প্রশ্নের উত্তর চিঠির শেষে তুমিই দিয়ে দিয়েছ। দেখো প্রেম করা খুব স্বাভাবিক মানবিক প্রবৃত্তি। তবে পড়া আর প্রেম একসাথে যায় না। খুব দৃঢ় বা পড়াশুনোর অবিচলদের ক্ষেত্রে সম্ভব হলেও হতে পারে। তবে সাধারণ মানের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে প্রেম ও পড়াশোনার মধ্যে হয় প্রেম থাকে, না হয় পড়াশোনা থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পড়াশোনায় বিঘ্ন ঘটে ফলে নানা বিপত্তি ঘটে। বাড়িতে বকাঝকা চলে এবং শেষমেষ প্রেমও পলাতক হয়। তুমি আগে নিজের কাছে পরিষ্কার হও, বাবার ভয়ে প্রেমের সম্পর্কে যেতে ভয় পাচ্ছ না পড়াশোনায় মনোযোগী থাকতে চাইছ। তুমি বলেছ তুমি পড়াশোনা করতে চাও তাহলে তো তোমার কাছে উত্তর আছে। তুমি যেটা করতে পারো, ছেলেটাকে 'হ্যাঁ' বলবে বা ' না'বলবে, সেটা আগে স্থির কর। মনে মনে নাটকের মতো করে অভ্যাস কর। স্কুলে যাও। ছেলেটা চেপে ধরলেই আত্মবিশ্বাসের সাথে তোমার উত্তরটা বলে দিও, তাহলেই তোমার কার্যসিদ্ধি। শুধু এটা মনে রেখ তুমি লিখেছ 'প্রেমের প্রস্তাবেই পড়া ভুলতে বসেছি', তাহলে প্রেমে পড়লে তার পরিণতি কী হবে সেটা ভেবে রেখ।

অনলাইনে

‘সুস্বাস্থ্য’

পড়তে চান?

বার্ষিক মাত্র ২২০ টাকা দিয়ে এখনই গ্রাহক হোন।
শারদীয় বা বিশেষ সংখ্যার বর্ধিত মূল্য লাগবে না।

পেফোনে–৯৮৩০০৬৭৩২৯

অথবা

SBI, Ballygunge Br.

A/C SUSWASTHA, A/C NO. 36086537710. IFSC: SBIN0000018

টাকা জমা দিয়ে আপনার ই–মেইল অথবা

হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার পাঠান

সুস্বাস্থ্য প্রকাশনী'র বই

২এ, ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন্‌স, কলকাতা-৭০০ ০১৯, ফোন : ২৪৬০-৪৬৬২

হার্ট সুস্থ রাখার চাবিকাঠি	ডাঃ শংকর কুমার চ্যাটার্জি	১৫০ টাকা
গর্ভাবস্থার A টু Z	ডাঃ অবিনাশচন্দ্র রায়	১০০ টাকা
স্ত্রীরোগ	ডাঃ অবিনাশচন্দ্র রায়	১০০ টাকা
সহবাস ছাড়াই প্রযুক্তির মাধ্যমে গর্ভধারণ	ডাঃ অবিনাশচন্দ্র রায়	৬০ টাকা
চাইলেই ছেলে-চাইলেই মেয়ে	ডাঃ সবুজ সেনগুপ্ত	১০০ টাকা
স্বপ্নসন্তান	ডঃ সিদ্ধার্থ গঙ্গোপাধ্যায়	৮০ টাকা
বাকি জীবনটা সুখে বাঁচুন	ডঃ সিদ্ধার্থ গঙ্গোপাধ্যায়	৫০ টাকা
মিউজিক ম্যাজিক	ডঃ সিদ্ধার্থ গঙ্গোপাধ্যায়	৬০ টাকা
বাচ্চা মানুষ করার অসাধারণ টিপ্‌স	ডঃ সিদ্ধার্থ গঙ্গোপাধ্যায়	১০০ টাকা
যেসব বাবা-মায়েরা এগিয়ে থাকতে চান	ডঃ সিদ্ধার্থ গঙ্গোপাধ্যায়	১০০ টাকা
মগজ বড় মজার জিনিস	ডঃ সিদ্ধার্থ গঙ্গোপাধ্যায়	১৫০ টাকা
স্মৃতিবৃদ্ধির সাতকাহন	ডাঃ মধুসূদন ভৌমিক	১০০ টাকা
শিশুর পড়াশোনা	পার্থ প্রতিম রায়	১০০ টাকা
স্বাস্থ্যের বর্ণপরিচয়	ডাঃ রমেশচন্দ্র বেরা	৩০ টাকা
ভালো রেজাল্ট করতে হলে	ডাঃ জাকির হোসেন	১০০ টাকা
চেনা ত্বক অজানা কথা	ডাঃ কৌশিক লাহিড়ী	৬০ টাকা
ত্বক নিয়ে ঝকমারি	ডাঃ কৌশিক লাহিড়ী	১০০ টাকা
থাইরয়েডের সমস্যা	ডাঃ শুভঙ্কর চৌধুরী	৬০ টাকা
কিশোর মনের কত কথা	ডঃ তনুকা দাঁ	১৫০ টাকা
শিশুমন নয়তো যেমন তেমন	ডঃ তনুকা দাঁ	১২০ টাকা
মনের কথা	ডাঃ অমরনাথ মল্লিক	৫০ টাকা
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য	ডাঃ অমরনাথ মল্লিক	১০০ টাকা
জেনে রাখলে ক্ষতি কি	ডাঃ অমিতাভ ভট্টাচার্য	৬০ টাকা
ঘরে বসে ফিজিওথেরাপি	সত্যজিৎ ব্যানার্জি	৬০ টাকা
বিপদ থেকে বাঁচুন	সম্পাঃ : কাঞ্চন সানা	১০০ টাকা
সুগার থেকে বাঁচুন	সম্পাঃ : কাঞ্চন সানা	৮০ টাকা
ঘরোয়া অসুখে হোমিওপ্যাথি	ডাঃ রামকৃষ্ণ ঘোষমণ্ডল	৮০ টাকা
চোখের কথা	ডাঃ দিলীপ কুমার বর্মণ	৪০ টাকা
হাতের মুঠোয় হাঁপানি	ডাঃ প্রিয়তোষ ধল্ল	৬০ টাকা
বাত সারে হোমিওপ্যাথিতে	ডাঃ বিকাশ মণ্ডল	৪০ টাকা
রোগ চিনতে রোগ প্রতিরোধ করতে	ডাঃ রমেশচন্দ্র বেরা	১৫০ টাকা
যৌনরোগে যোগব্যায়াম	অমল কাঁড়ার	৬০ টাকা
শিশুদের পরিচর্যা	ডাঃ মৈত্রেয়ী চক্রবর্তী	২০০ টাকা
চাইলেই সন্তান না চাইলে নয়	ডাঃ দেবব্রত রায়	৬০ টাকা
বয়ঃসন্ধি	ডাঃ দেবব্রত রায়	৫০ টাকা
ভেষজ মহৌষধি (১ম খন্ড)	ডাঃ মদনমোহন বেরা	২০০ টাকা
ভেষজ মহৌষধি (২য় খন্ড)	ডাঃ মদনমোহন বেরা	২০০ টাকা
ব্যবহারিক জ্যোতিষ	অরুণ কুমার সেনগুপ্ত	১০০ টাকা
জ্যোতিষ আলোকে জীবন জিজ্ঞাসা	তপন শাস্ত্রী	২০০ টাকা
জীবন দর্পণ	তপন শাস্ত্রী	৪০০ টাকা
জীবন জ্যোতিষ	তপন শাস্ত্রী	৪০০ টাকা
জ্যোতিষশাস্ত্র কি বিশ্বাসযোগ্য	অসীম আচার্য চৌধুরী	১০০ টাকা
বাস্তুবিজ্ঞান (প্রতিকার সহ)	অধ্যাপক ডাঃ অভিজ্ঞান আচার্য্য	১০০ টাকা
সরল জ্যোতিষ (প্রতিকার ও টোটকা সহ)	অধ্যাপক ডাঃ অভিজ্ঞান আচার্য্য	১৫০ টাকা
Human Resource		**Rs. 300**

প্রাপ্তিস্থান

ব্লিস, ৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯, ফোন : 7908352890, 033-22416430, 9331079305

Peerless | Hospital

Orthopaedics & Traumatology

SERVICES

- **First Time in Eastern India Knee, Shoulder and Hip Replacement using 3D Robotics, AI Platform and Mixed Reality with Hololens powered by Microsoft**

- Advanced Trauma and Polytrauma Surgery
- Knee, Shoulder and Hip Replacement Surgery
- Reconstructive Surgery
- Arthroscopy
- Hand Surgery
- Paediatric Ortho Surgery
- Sports Injury Management
- Trigger Finger Release
- Spinal Fixation
- Tennis Elbow Surgery
- Disc Surgery

To prevent falling behind tomorrow take a step ahead **TODAY**

NABH ACCREDITED

360 Panchasayar, Kolkata-700094

Appointment cell: 033 40333333 Help Line : 033 40111222

Website: www.peerlesshospital.com